CHIDAMBARA-SANCHAYAN

(Bengali version of Sumitranandan Pant's selection of Hindi Poetry)

Bharatiya Jnanpith Publication

First Edition 1960

Published by Shri Lakshmichandra Jain, Secretary, Bharatiya Jnanpith, 9 Alipur Park Place, Calcutta 27 and printed by Shri G. C. Ray at Navana Printing Works Private Ltd., 47 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.



প্রস্তাবনা

কবি সুমিত্রানন্দন পন্ত হিন্দি সাহিত্যের একজন যুগপ্রবর্তক কবি। তিনি ভারতীয় কাব্য-চেতনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন এবং কাব্যভঙ্গীতে এনেছেন রূপসৌন্দর্যময় এক নব্যরীতি। কবি সুমিত্রানন্দন পন্তের 'চিদম্বরা' কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত পঞ্চাশটি কবিতার বাংলা রূপান্তর প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ আজ আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। আজ ভারতীয় সাহিত্যের কোনো রুচিবান পাঠকেরই অজানা নেই যে, 'চিদম্বরা' কাব্য গ্রন্থটিকে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ তাঁদের প্রবর্তিত সাহিত্য পুরস্কার দ্বারা সম্বর্ধিত করেছেন। প্রতিবছর ভারতীয় জ্ঞানপীঠ তাঁদের পুরস্কারের নিয়মানুসারে একবিশেষ সময়কালে রচিত এমন সৃজনশীল সাহিত্যকৃতিকে একলক্ষ মুদ্রার এক পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করে থাকেন যা ভারতীয় সাহিত্যের এক সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। 'চিদম্বরা' ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে প্রমাণিত।

এ বছর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হ'ল। ইতিপূর্বে ১৯৪৫ সালে শ্রী জি. শঙ্কর কুরুপ তাঁর মলয়ালম্ কাব্যগ্রন্থ 'ওটকুঝলের' জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বাংলার কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৫ সালে তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য এই পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৪৫ সালে ডকটর কে. বি. পুট্টপ্পা তাঁর কানাড়া ভাষায় রচিত মহাকাব্য শ্রীরামায়ণদর্শনম্ এবং গুজরাতি কাব্য সংগ্রহ 'নিশীথ' এর জন্য শ্রীউমাশঙ্কর যোশী যুগ্মভাবে এই পুরস্কার লাভ করেন। প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানী দিল্লীতে। এই উৎসবের মাধ্যমে পুরস্কারের প্রতীক 'বাগ্দেবীর' একটি ধাতব-প্রতিমা এবং একলক্ষ টাকার একটি চেক্ পুরস্কারবিজয়ীকে প্রদান করা হয়।

জ্ঞানপীঠের এই পুরস্কার বিতরণ উৎসবের আর একটি উল্লেখনীয় মহৎ কার্যক্রম হ'ল, এই সংস্থা একই সঙ্গে ওই দিনে, পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থটির হিন্দি অনুবাদেরও প্রথম প্রকাশনোৎসব সম্পন্ন করে থাকেন। ইতিপূর্বে জ্ঞানপীঠ যেসব গ্রন্থকে পুরস্কৃত করেছেন যেমন 'ওটক্কুঝল', 'গণদেবতা', 'শ্রীরামায়ণদর্শণম্' এবং' নিশীথ' প্রভৃতির মূল ভাষা মলয়ালম্, বাংলা, কানাড়া এবং গুজরাতি থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে। এবছর ১৯শে ডিসেম্বর দিল্লীতে 'চিদম্বরা'র বরেণ্য কবি শ্রী সুমিত্রানন্দন পন্ত এর সম্মানার্থে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে পুরস্কৃত গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদের প্রকাশনের প্রশ্নটি অবান্তর। কারণ 'চিদম্বরা' হিন্দি ভাষায় রচিত একটি কাব্যকৃতি।

ভারতীয় জ্ঞানপীঠের ন্যাসধারী মণ্ডলী তাই এবছর স্থির করেন যে উৎসবের প্রস্তুতিপর্বের জন্য হাতে যে চার পাঁচ মাস সময় রয়েছে সেই সময় কালের মধ্যে 'চিদম্বরা' থেকে কিছু কবিতা নির্বাচন করে নিয়ে তার ইংরেজি এবং অন্যান্য কোন কোন ভারতীয় ভাষায় দ্রুত অনুবাদ সম্ভবপর করা যেতে পারে তা নিরূপণ করা। বলাই বাহুল্য, পর্যালোচনার এই পর্যায়টি যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য ছিল। কবিতা চয়নের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, যোগ্য অনুবাদকের সন্ধানলাভ, সময় মত অনুবাদ কার্যটির সুসমাপন, অনুবাদগুলির সুযোগ্য পরিমার্জন এবং সমারোহ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তার মুদ্রণ ও প্রকাশনের সম্ভাবনা কতদূর কাজে পরিণত করা যেতে পারে এই সব নানান কঠিন প্রশ্ন তাঁদের সামনে ছিল। কারণ বিচার করে দেখলে এই কর্মোদ্যোগের দায়িত্ব গুরুতর। ধরা যাক যদি পূর্বোল্লিখিত প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান সম্ভবপরও হয়, তাহলেও আবার আরো নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ত। সেগুলি হ'ল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ এবং প্রকাশনের জন্য এককালীন ষাট সত্তর হাজার টাকার বিনিয়োগ এবং সর্বোপরি অনুবাদ গ্রন্থগুলির বিপণন সমস্যা। স্বভাবতঃই কবিতার বইএর ক্রেতার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাছাড়া অনুবাদ কবিতা গ্রন্থের বিক্রি আরও আয়াস সাধ্য।

মূল 'চিদম্বরা' কাব্যগ্রন্থে মোট ১৯৬টি কবিতা আছে। কবি সুমিত্রানন্দন পন্তের এই কাব্যগ্রন্থ থেকে পঞ্চাশটি নির্বাচিত কবিতা নিয়ে চিদম্বরার এমন একটি সঞ্চয়ন করা স্থির হ'ল যাতে কবির বিশাল ও ব্যাপক কাব্যকৃতির

যথাযোগ্য প্রতিফলন উপস্থাপিত করা সম্ভবপর হয়। মূল চিদম্বরা গ্রন্থটিই কবি সুমিত্রানন্দন পন্তের এগারোখানি কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়িত কবিতাবলীর একটি সঙ্কলন। কবির এই এগারোখানি বই হ'ল যথাক্রমে '—(১) যুগবাণী (২) গ্রাম্যা (৩) স্বর্ণকিরণ (৪) স্বর্ণধূলি (৫) যুগপথ (৬) উত্তরা (৭) রজত-শিখর (৮) শিল্পী (৯) সৌবর্ণ (১০) অতিমা (১১) এবং বাণী। এই কবিতাবলীর রচনাকাল হ'ল ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। মূল 'চিদম্বরা' কবি পন্তের কাব্য বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। 'চিদম্বরা'র ভূমিকায় কবি লিখছেন :

"আমার কাব্যগ্রন্থ 'চিদম্বরা'তে আমার ভৌতিক, সামাজিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক মানস সঞ্চরণের এক পরিচয় একটি আধারে একত্রিত করায় পাঠকের পক্ষে রচনাগুলির মধ্যে ব্যাপ্ত ঐক্যের মূলসূত্রটিকে অনুধাবন করা সহজতর হয়ে উঠবে। এই কাব্য সংকলনে আমি আমার নিজের সীমার মধ্যে আমার সমকালীন যুগের অন্তর্জীবন এবং বহির্জীবন তথা যুগচৈতন্যকে নবীন মানবতার কল্পনা দ্বারা মণ্ডিত করে ভাষাদেবার প্রয়াস করেছি। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমার 'যুগবাণী' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'বাণী' পর্যন্ত আমার কাব্য-চেতনার একটিই মাত্র সঞ্চরণ ক্ষেত্র রয়েছে। যে ক্ষেত্রের ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উপস্থাপনের সার্থকতা একমাত্র মানুষের প্রগতির জন্য নির্ধারিত রয়েছে এবং অনিবার্য রূপে তা থাকবেও। 'যুগবাণী' এবং 'গ্রাম্যা'তে আমার দৃষ্টিকোণ মানবজীবনের সত্যগুলির প্রতি সমন্বয়াত্মক ছিল। আমার উত্তর-কালের কাব্যধারায় এই সমন্বয়াত্মক দৃষ্টিকোণকে অতিক্রম করে আমি আরো উদার দিগন্ত উদ্ঘাটন করেছি। ভূতবাদ এবং অধ্যাত্মবাদ এই দুই দর্শনই আমার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। আমার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য ভাবনার যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে নবীন চেতনার কাব্য। যে কাব্যচেতনায় মানবমনের উচ্চ এবং স্বাভাবিক স্তরে স্তরে সঞ্চারিত সমাজচেতনা এবং মানবতা বোধ বর্তমান আছে। আমার কাব্য চেতনা মূলতঃ নবীন সংস্কৃতির কাব্য চেতনা। যে চেতনায় বাচ্যাত্মিকতা তথা ভৌতিকতা ও নবীন মনুষ্যত্বের নাড়িযোগ ঘটেছে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে। আমার কাব্য প্রথমত এই যুগের মহান সংঘর্ষের কাব্য। যাঁরা যুগ সংঘর্ষকে কেবল শ্রেণী সংঘর্ষের সীমিত অর্থে বোঝেন এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক স্তর থেকে যুগসংঘর্ষকে প্রত্যক্ষ্য করেন

আমি তাঁদের কথা বলছি না। 'যুগবাণী' থেকে 'বাণী' পর্যন্ত আমার সমস্ত কাব্য যুগমানব এবং নবমানবের অন্তরতম সংঘর্ষের কাব্য। আমার কাব্য চেতনা কেবল মধ্যযুগীয় নৈতিক এবং বৌধিক অন্ধকারময়তা এবং তজ্জনিত সীমিত দৃষ্টিকোণের সংগে সংঘর্ষে রত নয়। এ চেতনা ভাবী মানবতার পথের বহিরন্তরের দুর্গম অবরুদ্ধতার নিত্যনিরন্তর সংগ্রামে রত।"

'চিদম্বরা'র বর্তমান সঞ্চয়নের পঞ্চাশটি কবিতাবলী ভাবদর্শনের সমগ্রতার দিগ্‌দর্শক বিষয়গত বিবিধ প্রযত্ন শৈলী মাধ্যম, কবির কাব্য চেতনার কলিকাটির নয়নোন্মীলন এবং প্রসারে বিহঙ্গের পক্ষ সঞ্চালন ও উড্ডীনতার প্রমাণ স্বরূপে। রঙিন সুষমা ও করুণা ভরা লেখনীতে অঙ্কিত গ্রামীণ চিত্র, যুগসংঘর্ষের তীব্র অনুভূতিমালা, পার্থিবের মাধ্যমে অপার্থিবের সংগে সাক্ষাৎকারের সাহসিক প্রযত্ন, লোকমঙ্গলের স্থায়ী বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য করিব যে বিরাট প্রচেষ্টা তারই যোগ্য প্রতিফলন দেখা যায় বর্তমান সংকলনের এই পঞ্চাশটি নির্বাচিত কবিতায়।

বর্তমান সংকলনে মূল চিদম্বরার অনেক দীর্ঘ কবিতা সঙ্কলিত হওয়ার আবশ্যক ছিল। যদি এই সব দীর্ঘ কবিতাগুলিকে পূর্ণাঙ্গরূপে সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করা যেত যেমন, 'ফুঁলোকা দেশ', 'ধ্বংসশেষ', 'সৌবর্ণ', 'আত্মিকা', 'ঊষা', 'জন্মদিবস', 'সন্ধ্যা কে বাদ' এই ধরনের ১০।১৫টি কবিতাতেই অনুবাদ সঙ্কলনটির আয়তন পূর্ণ হয়ে যেত। এজন্য দীর্ঘ কবিতাগুলিকে স্থানে স্থানে সংক্ষেপিত করা হয়েছে। অবশ্য সংক্ষেপ করতে গিয়ে যাতে অনুবাদের কাব্য কল্পনা ও অনুবাদ চিন্তনে কবির বহুমুখী প্রয়াসের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কবি সুমিত্রানন্দন পন্ত নিজেই এই পঞ্চাশটি কবিতার নির্বাচন বিষয়ে পরামর্শ দান করে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আমরা এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

পূর্বোল্লিখিত আলোচনাসূত্রে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে পন্তের কবিতা বিভিন্ন উত্থান ও যাত্রার মধ্য দিয়ে পর্যায়ে পর্যায়ে নব নব লক্ষ্যে পৌঁছে নতুন বাঁক নিয়েছে। প্রকৃতির সরল অনুভূতির মোহময় অভিব্যক্তির প্রসাদপূর্ণ রচনা থেকে যুগ সংঘর্ষ এবং যথার্থ জীবনবোধের বাণীপূর্ণ সাদাসিধে ভাষায় লেখা তীব্র কবিতার নতুন চিন্তার জগতে পরিক্রমণ ; আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে তাকে এই বাস্তব পৃথিবীতে উত্তরণ করার সংগ্রামে রত, সামঞ্জস্য ও

সমাধানের পরম উপলব্ধির কিরণে অনুরঞ্জিত অর্থগূঢ় কবিতা পর্যন্ত পন্থের রচনা শৈলী এবং শব্দসম্পদের জগতে প্রবেশ করা হ'ল এক পরিশ্রমী প্রয়াস এবং এক মহান সাধনা। সেই কারণেই এই কবিতাবলীর অনুবাদকের একটি জাগ্রত কবিহৃদয় থাকার প্রয়োজন। যাতে করে তিনি আপন প্রতীতির আলোকে কবিতাগুলিকে বিচার করতে পারেন। এজন্য নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে তাঁকে শব্দকোষের সাহায্যও গ্রহণ করতে হয়। তা সত্ত্বেও যদি কবিতাগুলির পূর্ণ-বিম্ব অনুবাদে স্পষ্ট না হয়ে ওঠে এবং কাব্যভঙ্গিমার অনন্য রূপের দ্বারা কবি তাঁর যে অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তা যদি উদ্ভাসিত না হয়ে ওঠে এবং অনুবাদক যদি সেই অভিপ্রায়টিকে যথাযথ আত্মসাৎ করে আপন ভাষায় ও ভাবে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাহলেও কিছু কিছু পাঠক কেবল শব্দ মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতার অনুবাদ বাইরের আঙ্গিকে কতটা হয়েছে শুধু তারই পরীক্ষা করে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কাব্যের মূলে পৌছোতে পারেন না। আবার কেবল রসবোধের যথাযথ উপস্থাপনই শুধু অনুবাদকের লক্ষ্য হয় তাহলে অনুবাদক নিজেই রচনাকার হয়ে বসেন। এবং তাই যদি শব্দার্থের আধারে অভিব্যক্তি উপস্থাপিত করা যায় তাতে রস ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এজন্য চিদম্বরার সঙ্কলনের জন্য আমাদের এমন অনুবাদকের প্রয়োজন ছিল যাঁর হাতে অনুবাদ তথা রূপান্তর,—ভাববোধ তথা রসবোধ, শব্দার্থ এবং ব্যঞ্জনার একত্র প্রকাশের সর্ব ভার ছেড়ে দেওয়া যায়, কেননা তিনি আবার ভাষার প্রকৃতির অনুরূপ করে আপন বিবেক প্রদর্শিত পথে তাঁর অনুবাদকর্মকে পরিচালনা করবেন এবং সফলতা ও অসমানতা সীমার বাইরে আসবেন সুস্পষ্ট উত্তরণের পথ ধরে। এছাড়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে খুব দ্রুতভাবে যা সম্পন্ন করতে পেরেছেন প্রথম প্রয়াস হিসাবে তা উল্লেখনীয়। অবশ্য পাঠকই এর উৎকর্ষের বিচার করবেন। ইংরাজি অনুবাদ কর্মের পরিমার্জন ও সম্পাদনা কার্যের সংগে সক্রিয়ভাবে—সহযোগিতা করতে গিয়ে আমি নিজেই অনুভব করেছি যে একাজ কতখানি শ্রমসাধ্য এবং দুষ্কর। এবং নিখুঁত করার জন্য আরো কত বেশি সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করা প্রয়োজন। এইভাবে মূল রচনার সংগে বাংলা অনুবাদ আদ্যোপান্ত মেলাতে গিয়ে পরিমার্জনের সামান্য অবকাশ থাকাসত্ত্বেও অনুবাদের সাফল্য অনন্যসাধারণ। অন্যান্য ভাষার অনুবাদও উৎকৃষ্ট হতে পারে, সাধারণ হতে পারে কিম্বা মধ্যমমানেরও হতে পারে।

গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশনা কাজে দায়িত্ব গ্রহণ না করলে অনেক সমস্যা ও সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার হাত থেকে হয়ত অব্যাহতি পাওয়া যেত। কিন্তু জ্ঞানপীঠের মত একটি সংস্থা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সাহিত্য পুরস্কারের প্রবর্তনা করেছেন তাহ'ল ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের এক আদর্শ-মণ্ডিত প্রতিজ্ঞা। তাই জ্ঞানপীঠের উদ্দেশ্য হ'ল অনুবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র-ভারতীর প্রতিভার পূজা এবং বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সক্রিয় আদান-প্রদানের এক বিনীত সংকল্পে একাগ্র থাকার দায়িত্ব গ্রহণ করা। এই কারণে তাঁরা চিদম্বরার অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং জ্ঞানপীঠের প্রকাশন প্রচেষ্টাকে এক নবতর উদার বেদীতে সমাসীন করেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ বিষয়ে দু একটি জ্ঞাতব্য তথ্য নিবেদন করি। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপক ট্রাস্টি হলেন শ্রীশান্তিপ্রসাদ জৈন এবং তাঁর পত্নী শ্রীমতী রমা জৈন। জ্ঞানপীঠের প্রারম্ভিক কার্যক্রম দুই ধারায় বিভক্ত। প্রথম ধারাটি হ'ল প্রাচীন ভারতীয় কথ্যভাষায় অপ্রকাশিত অলব্ধ সামগ্রীর সম্পাদনা ও প্রকাশনা। বিশেষ করে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাপ্রশাখা ও বিভিন্ন সাহিত্যের প্রকাশন, যা এতদিন উপেক্ষিত ছিল, যেমন সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, অপভ্রংশ তামিল ইত্যাদি ভাষার প্রাচীন সাহিত্য। কার্যক্রমের দ্বিতীয় ধারা হ'ল সমসাময়িক সাহিত্যের প্রণয়ন ও প্রকাশন। বিশেষ করে যাতে—হিন্দি সাহিত্যে আরও সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশ হয় এবং সাহিত্যে নতুন চেতনার সঞ্চার ঘটে। প্রাচীন কথ্যভাষার সংগে সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানপীঠের 'মূর্তিদেবী' গ্রন্থ-মালায় আজ পর্যন্ত ৭০টি গ্রন্থ এবং সমসাময়িক সাহিত্যের সংগে সম্বন্ধযুক্ত লোকোদয় গ্রন্থমালায় আজ পর্যন্ত ২৯০টি গ্রন্থের প্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞানপীঠের বাৎসরিক পুরস্কার উৎসবে দেশের সমগ্র সাহিত্যকে ভাষা ও অঞ্চলগত সীমার উর্দ্ধে এনে ভারতীয় সাহিত্যের এক সাধারণ উদারমঞ্চে স্থাপন করার এক সাহসী প্রচেষ্টা করা হয়। নিঃসন্দেহে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভাষায় আঞ্চলিক পুরস্কার ও স্বীকৃতির নিয়মিত আয়োজন আছে। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের বিচারের মানদণ্ডে সেই সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার কি হবে এবং বরেণ্য সাহিত্যিকগণের সাহিত্যকীর্তির বিচার করতে গিয়ে বিদেশী পাঠকগণ কোনো বিশেষ ভাষার সাহিত্য পাঠ করে ভারতীয়

সাহিত্যের বিচার না করে আরো উদার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে সাহিত্যের পরিচয় লাভ করেন। এই জন্যই এই পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। তাই আমরা জোর করে একথা কখনই বলবনা যে আমাদের পুরস্কার-ধন্য সাহিত্যিকই অখিলভারতীয় স্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি নির্বাচন কালে হয়ত কোনো উৎকৃষ্ট সৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত থেকেও যেতে পারে। তবে এই পুরস্কারকে মহৎ ও স্মরণীয় বলে মানা হয় এর অন্যান্য অনেক অন্তরঙ্গ গুণাবলীর জন্য। এই অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিদ্বান বন্ধু ডক্টর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং তাঁর সহযোগী শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থমালার সম্পাদক হিসাবে আমি এত অল্পসময়ের মধ্যে তাঁদের এই অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। অনুবাদের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিবদ্ধ থাকাকালীন বন্ধুবর ডক্টর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তাঁর সহযোগী এবং অন্যান্য ভাষার অনুবাদক বন্ধুবর্গ পত্রদ্বারা বা সাক্ষাতে কবিতাগুলির বিষয়ে যে সব মতপ্রকাশ করেছেন, তাতে কবির প্রতিভার অনেক নিগূঢ় পরিচয়, কাব্যমাধুরীর রস, কল্পনার চমৎকারিত্ব, এবং চিন্তার কাব্যময়তার অদ্বিতীয় দিকটি আন্তরিকভাবে তাঁদের উপলব্ধ হয়েছে। অনুবাদকেরা নিজেরাই উপলব্ধি করেন যে আরো বেশি সময় হাতে পেলে তাঁরা মূলের শ্রী এবং সুগন্ধকে আরো বেশি শুদ্ধরূপে উপস্থাপিত করতে পারতেন। আগামী সংস্করণের জন্য এই সর্ব সংস্কার স্থগিত রইলো। পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ রইল যে তাঁরা এই অনুবাদিত কাব্যসঞ্চয় পাঠ করে তাঁদের আপন আপন প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করবেন এবং আগামী সংস্করণে যথাযোগ্য সংশোধনে সহায়তা করবেন। চিদম্বরার এই সঞ্চয়নের —ইংরেজি, কানাড়া, গুজরাতি, তেলুগু, বাংলা, মারাঠি এবং মলয়ালম্ অনুবাদও পাওয়া যাচ্ছে। চিদম্বরার এই নির্বাচিত পঞ্চাশটি কবিতার সংকলন মূল হিন্দিভাষাতেও প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এই গ্রন্থটি পুরস্কার বিতরণী সমারোহে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। সমগ্র চিদম্বরার মূল রূপেও হিন্দি সাহিত্যে পাওয়া যাচ্ছে। পুরস্কার সমারোহের সুন্দর অবকাশে আমি কবি সুমিত্রানন্দন পন্তকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

লক্ষ্মীচন্দ্র জৈন

সম্পাদক, লোকোদয় গ্রন্থমালা

মন্ত্রী, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ

অনুবাদকদের বক্তব্য

কবিতাগুলি অনুধাবন সূত্রে শ্রীরামব্যাস সিং এবং শ্রীঅশোক সিং-এর মূল্যবান নির্দেশ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। প্রকাশকের বক্তব্য তর্জমা করে দিয়েছেন শ্রীমতী কবিতা সিংহ। সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

চিদম্বরা-সঞ্চয়ন

সুমিত্রানন্দন পন্ত

নবদৃষ্টি

খুলে গেল ছন্দের বন্ধন
রজতশৃঙ্খল অনুপ্রাস,
গীতিকল্প মুক্ত বিলক্ষণ,
যুগবাণী বহে অপ্রয়াস।
জগতের যতো রূপ-নাম
আজ হয়ে ওঠে শিল্পানুগ,
জীবন সংঘর্ষ দেয় সুখ,
চিত্তে সুখ জাগে অভিরাম!

সত্য শিব এবং সুন্দর
শিল্পের কল্পিত মূল্যমান,
হয়ে গেল নয়নগোচর
জীবনের সঙ্গে একপ্রাণ।

হয়ে ওঠে মানবস্বভাব
মানব আদর্শ শ্রেয়স্কর,
অপূর্ণকে পূর্ণ করে তোলে,
অসুন্দর হয়েছে সুন্দর!

পিঁপড়ে

পিঁপড়ে দ্যাখোনি ?
সূক্ষ্ম সরল কালো রেখা বুনি
রাতের সুতোর মতো হেলে দুলে
চলে লঘুপায়ে পলে পলে মিলে
ঐ পিপীলিকাদল !
দ্যাখোনা কেমন ভঙ্গিতে চঞ্চল,
কাজ ক'রে শুধু চলছে সতত !
নীবার চয়নে হয়না বিরত !
শিশুদের রাখে স্নেহ-পাহারায়,
লড়ে, শত্রুকে তিল না ডরায় ।
সোনালি সাজায়, তক্‌তকে রাখে
ঘর, অঙ্গন, জনপথটাকে !
দ্যাখো বল্মীক কতো সুন্দর
ওরই তো ভিতরে দুর্গ, নগর,
অদ্ভুত ওর রচনাকার্য,
শিল্পীর কাছে মহাশ্চর্য ।
সৌধ, আলয়, জনপথ আর
আঙিনা, গোয়াল, সুরক্ষাগার,
শোভিত শিবির, জরায়ু-সদ্ম,
কতো যে তোরণ, টানা রাজপথ ;
পিঁপড়ে হলেন প্রাণী সামাজিক
শ্রমজীবী আর সৎ নাগরিক ।
তোমরা জানো তো পিঁপড়ে কেমন,

জানো তার মন ?
চূর্ণ চূর্ণ পিঙ্গলসার
লুকিয়ে নেয় না ক্ষুদ্র আকার,
সারা পৃথিবীতে ওযে নির্ভয়,
ঘুরে-ঘুরে মরে, শ্রমতন্ময়,
আলোর ফুলকি অক্ষয় রয়।
শরীর কি ওর এক ফোঁটা তিল ?
প্রাণের ছন্দে ঝলে ঝিল্‌মিল ?
সারা দিনমান চলে জোট বেঁধে
ক্লান্তি মানে না, কাজে রয় মেতে।
ভেবেছো ও বুঝি রয় শরীরেতে ?
ওকি, কণা, নাকি অণু পরমাণু,
চিরসক্রিয়, ওতো নয় স্থাণু !
হায় রে মানব !
তুমি দেহময়, তুমি শুধু শব।
দেহভাবনায় আছো নিশিদিন
দেহসার, আর ত্রিতাপ প্রাচীন।
প্রাণীপ্রবর
সঁপে দিলে ভর
ক্ষণধূলি পর !
ধিক মৈথুন আহার যন্ত্র !
তুমি এই বালুভিত্তির পর !
রচবে কি ওগো শ্রেষ্ঠ অমর
জনসমাজের নব্যতন্ত্র ?
মানুষের এই সমূহ ক্ষমতা ?
পশুপাখি আর ফুলের সমতা ?
মানবতা আজ পশুর সমান ?
জীবতত্ত্বে কি রয়েছে প্রমাণ ?
বহিরঙ্গে না, মনেই সাম্য,

মানব সমাজে সেই তো কাম্য
মানুষের কাছে বড়ো আদর্শ
সংস্কৃতি ও স্ব-উৎকর্ষ,
বহির্নিয়ম সেতো বন্ধন ;
সাম্য যদিনা অন্তর্গত
তার দাম নেই পিঁপড়ের মতো,
সেতো শুধু জড়, পিঁপড়ে চেতন।

পাতা ঝরা

রিক্ত আজ ডাল-পালা তবু তুমি দূর করো ভয়.
রক্তমাংসে হবে জানি জীবন্ত পাতায় বর্ণময়
মৃত্যু সেতো জন্মশীল ! অমরতা মৃত্যুতে জীবন,
সনাতন ঝরে গিয়ে পল্লবিত আবার নূতন !

মানব জীবনে আজ পাতা ঝরা হয়েছে গোচর,
যুগ শেষ হয়ে এল যেন বা হতেছে যুগান্তর,
গেছে বহু হিমযুগ, শরৎ, বিপুল পরাভব,
ধরার জীবনে জানি আসিবে বসন্ত অভিনব !

ঝরে যদি যায় যাক্ তবু তুমি দূর করো ভয়,
নওল মুকুল নিয়ে পৃথ্বী ফের হবে প্রাণময়
শতাব্দী শতাব্দী শেষে নরলোকে পাতা ঝরে আজ
শতাব্দী শতাব্দী জুড়ে মধুমাস মানব সমাজ।

দুটি ছেলে

আমার অঙ্গনে ওরা (টিলার উপরে মোর ঘর)
দুটি ছেলে চলে আসে অবসর কি অনবসর,
আদুল সুঠাম বেশ খোলামেলা শামলা কিশোর
মাটির পুতুল ময়লা, স্ফুর্তিবাজ তবু পরস্পর।
টিলার তলায় ওরা ওঠে নামে বড়োই তৎপর,
দুজনে কুড়িয়ে নেয় ধুলো থেকে যা কিছু সুন্দর,
শূন্য সিগারেট কৌটো চোখ-চমকানো রাংতা সবি
অথবা ফিতের টুকরো, হলুদ অথবা নীল ছবি,
মাসিক পত্রের রাশি ! শাখামৃগ থেকে নেয় ভরে
হর্ষধ্বনি, আর ওরা খুশি হয় ভিতরে ভিতরে,
অঙ্গন পেরিয়ে তবু বাধা ভাঙে যতোবার পারে
ছ-সাত-বছর-ছোট্ট তবু কি সুঠাম একেবারে।
কান্ত, কুঁদে-তোলা দেহ, ভোলায় নয়ন, কাড়ে মন,
মানব আত্মীয় ওরা ভরে তোলে হৃদয় গহন।
মানুষের ছেলে যদি হোক না সে অন্ত্যজ সন্তান,
মানুষই প্রতিটি রোমে, সত্যে ঢালা খাঁটি সেই প্রাণ।
অস্থি মাংস নিয়ে ওরা জগতে পেয়েছে নিজ ঘর,
আত্মার আবাস নয়, সে তো বড়ো সূক্ষ্ম অনশ্বর !
নশ্বর শরীরে জেনো আত্মার অর্পিত অধিষ্ঠান,
জগতের অধিকার আছে তার যে দুর্বল প্রাণ।
বহ্নি, বন্যা, উল্কা, ঝড়ে দুর্দম ভীষণ ধরণী এ,
কী করে মানবশিশু রয়েছে কোমল দেহ নিয়ে ?
নিষ্ঠুর প্রকৃতি জড়, বড়ো ক্ষণভঙ্গুর জীবন,

তাই মানুষের চাই মানুষের মতন সাধন।
কেন যে হবে না এক মানুষ মানুষ পরস্পর
মানবতা তুলে ধরে জগতের বুকে লোকান্তর।
জীবনের সৌধ ওঠে ধরণীতে মহিমা ক্ষোদিত,
মানুষ তো রাজ্য গড়ে, মানব মঙ্গল সুনিশ্চিত
জীবনের ক্ষণধুলি যেইখানে সুরক্ষিত রয়
শরীরী জনতা সাধ পূর্ণ সেথা হবেই নিশ্চয়।
যেথানে মানবপ্রেমে সমাসীন মানব ঈশ্বর
ধরাতলে বলো আর কোন স্বর্গ চাই অতঃপর

পুরুষের ছায়া

পুরুষই তো দুনয়ন মেলে
নিজ অঙ্গ হেরে অনুক্ষণ
পুরুষই তো অনুভূতি ঢেলে
মুগ্ধ হয়ে হেরে নিজ মন—
হেরো, আপনার দৃষ্টি থেকে
ওইখানে লজ্জিত উত্থান,
নিজেতেই লুকিয়ে নিজেকে
বিশ্ব থেকে হয় অন্তর্ধান !

সেই পুরুষের ছায়া নারী,
নতনেত্র, পদ বিজড়িত,
শংকাত্রস্ত যেন বা হরিণী,
নিজের চরণশব্দে ভীত।
মানবের সুচিরসঙ্গিনী
স্থাপিত ঘরের এক কোণে
দীপশিখা সদৃশ কম্পিত
করে ওযে জীবন যাপন
যুগ যুগ পশুপ্রপালিত
কামনার কারায় বন্দিনী
আদর্শ সুনীতি সঞ্চালিত !!

আমাকে স্বপ্ন দাও

আমাকে স্বপ্ন দাও, স্বপ্ন দাও
জীবনের জাগ্রত পুরুষ,
জীবনের নতুন নতুন স্বপ্ন দাও আমাকে।
স্বপ্ন-জাগর এই জীবন,
স্বপ্নই তো আনন্দস্মিত শরীর যৌবন মন,
আমার স্বপ্নের উদ্‌ঘাটনে
সারা জগতের অন্ধকার অন্তর্হিত হোক।
বাস্তবের জ্ঞানে অবসন্ন,
শুষ্ক মরুতে আমি ডুবে গিয়েছি
আমার স্বপ্নের ছায়ায়
জগতের বস্তুসত্য ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়।
শীতার্ত জীবন অরণ্য
স্বপ্নে হোক পল্লবিত, মুহূর্তেই
আমার কথায়, কাজে
নব নব স্বপ্নের গুঞ্জন হোক,
হে জীবনের জাগ্রত পুরুষ
ইহজীবনের নতুন স্বপ্ন দাও আমাকে।

দুই বন্ধু

নিরালা টিলায়
দুইজন ছলবলে
সাদৃশ্য বয়ে চলে,
বন্ধুর মতো খাড়া একঠায়
মৌন, চোখ জুড়ায়।

ওরা দুই মহীরুহ
সহে শীত দুঃসহ
বাড়ছে পরস্পর—
দীর্ঘ, সুদৃঢ়তর।

শীতের বেলায় সব পত্র গিয়েছে হায়
নগ্ন, সিতশাখায়
পাৎলা, তেরছা কতো ডালপালা
শিরা উপশিরা জাল অজস্র অবিরল—
তরুর চিত্ররেখা হুবহু যে অবিকল
মাটিতে ছায়াঙ্কিত।
নিরভ্র নীলাকাশে
চিত্রার্পিত দুই বৃক্ষ ওখানে ভাসে
চোখে লাগে সুন্দর
সুখে জাগে অন্তর।

ঝঞ্ঝায় নিমগাছ

সর্‌সর্‌ মর্মর—
নরম রেশমী স্বর
ঘন নিমমঞ্জরী
অথির চিকন ঝুরি—
নিশ্বাসে পরশনে
রোমাঞ্চ শিহরণে
পলে পলে বেড়ে যায় এ মাধুরী।

গাছের শিখর থেকে ঝরছে পৃথ্বীপর
কতো যে ধ্বনি-লহর
আর ছ্যাখো নির্ঝর
শিউরে শিউরে ঐ কেঁপে ওঠে থরথর
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌
মর্মর।

বিলুপ্ত হয়ে গেল যতো পল্লবদল
হরিতের গুঞ্জনে চঞ্চল
বাতাসের আবেগে অনর্গল
ধাতুপল্লবে যেন বাজে জল।
হুরুহুরু নিশ্বাসে থর্‌ থর্‌
শঙ্কিত, পীত, বড়ো দুর্বল
নিম্নপল্লবদল
পলে পলে ঝরে যায় অবিরল।

কালো মেঘ

চকিতে উঠল হেসে বিপুল কৃষ্ণ ঘন
গহন ভয়ংকর অন্ধকারের মুখ
আলোয় মুগ্ধ ক'রে চম্‌কে উঠলো কিছুক্ষণ ;
দীর্ণ দিগ্বিদিকে, গুরু গুরু গর্জন,
ছিঁড়লো তড়িৎযোগে অন্ধ সংবরণ,
ঘিরে-ঘিরে এসো মেঘ, রিমিঝিমি মাত্রায়
নতুন জীবন কণা ঢেলে দাও বর্ষণ।
ঘুরে ঘুরে ছেড়ে যাও আশ্রিত অম্বর—
এসো এসো এসো ঝড়
দুর্দম উদ্দাম, মুছে দাও গ্লানিকর
যতো দুঃসহ তাপ, করো স্নেহসিঞ্চন।
ইন্দ্রধনুতে করো দিগন্ত চিত্রিত
ময়ূরকলাপে কেকা পুলকিত
সবুজে সবুজে ভরো ধরণীকে
আর্দ্র করুণা ঢালো, ঘোর বজ্রস্বন।

বাণী

হে বাণী
আমাকে জীবনের ভাস্বতী ভাষা দাও
গগনের নীরবতা ভেদ করে
যে-বাণী উচ্চারণ করে তারা
যে-বাণীতে নিঃশব্দ গিরি থেকে নিঃসৃত
মুখরিত নির্ঝর।

যে বাণীতে মেঘ গর্জন করে,
সাগর ওঠে উর্মিল হয়ে
দামিনী ঝিল্‌কিয়ে ওঠে
ময়ূর নাচে অপূর্ব।

হে বাণী,
আমাকে চিরন্তন, সম্পূর্ণ বাস্তবের ভাষা দাও
যে বাণীর মন্ত্রে বায়ু
পুলকে অরণ্য ভরে দেয়,
মৃদু কুসুম মুঞ্জরিত হয়,
অণুতে অণুতে জেগে ওঠে লাস্য।

যে ভাষায় ক্ষুধাতৃষ্ণা
আর কামনায় দীপ্ত হয়ে ওঠে দেহ,
ইচ্ছা সুখ দুঃখ উত্থিত হয়,
এবং শৈশব, যৌবন—
হে বাণী
আমাকে অবিনশ্বর সৃষ্টির ভাষা দাও।

যা বহুবর্ণ গন্ধরূপে
　　　নিরন্তর সৃজনরত,
যে ভাষার অনুভবে
নিখিল চরাচর হয়ে যায় চুপ।

যে বাণীতে সুচির জন্ম মরণ,
আলো আর অন্ধকারের অতীত
যে-বাণী জীবনের জীবন
শাশ্বত সুন্দর অক্ষর,
হে বাণী,
আমার বাণীতে যেন উদ্‌ঘাটিত হয় অমৃত কণ্ঠস্বর

গ্রাম্য কবি

নেই এখানে অরণ্যমর্মর—
বিহঙ্গের সুরেলা গুঞ্জন ;
জীবনভরা সংগীত লহর—
তৃপ্তিহীন সত্তার ক্রন্দন ;
এখানে নেই শব্দের বন্ধনে
আদর্শের জীয়ন্ত প্রতিমা,
নিরর্থ এখানে চিত্র গীতি,
সংরচন সৌন্দর্যের সীমা ;
বড়ো শ্রীহীন ধরিত্রীর মুখ,
জনজীবন গর্হনীয় হায়,
ক্ষুব্ধ যেথা জঠর, নগ্নদেহ
সৌন্দর্যের মর্যাদা কোথায় ?
জর্জরিত মানুষ যেইখানে
পশুর মতন দিন যাপন করে
মনের শিশু-সরীসৃপ সম
অকালজরা যৌবন প্রহরে,
একেবারেই সুলভ নয় হেথা
সত্য শিব এবং সুন্দর,
হৃদয়ে উঠেছে কেঁপে কেঁপে
বীণার ব্যথাবিমূর্ছিত স্বর।

তন্বী গ্রামীণা

কানায় কানায় উত্তাল যৌবন
ঘন ঘটা যেন আষাঢ়ের প্রসাধন
শ্যামল বরণ
মৃদুল চরণ
ঐ চলে আসে গ্রাম্য যুবতী তার
গজগামিনীর গতি
সর্পিল পন্থার।
থমকে পথের ধারে
ঝুঁকে পড়ে মান ভরে
নয়ন ফেরায় জড়ায় আঁচলখানি
প্রেমিকের পদশব্দের ঝলকানি।
গ্রামীণ যুবন্ আসে
প্রণয়ের অভিলাষে
যেই চোখে পড়ে যায়
দুই চোখ মুদে আসে
আচম্‌কা উল্লাসে।
জলের ঘাটের ক্ষণ
নরনারী উচাটন
ভরাট গাগরী থেকে
সিঞ্চিত ডোর, প্রবল আকর্ষণে
ক্ষুব্ধ চোলির নিবিড় আস্ফালনে
যুগল কলস ভিজে যায় থেকে থেকে

জল ছলকায়
রসের ধারায়
ও যখন যায় ঘাট থেকে তার ঘরে
মাথার উপরে ঘট
বুকে বাস সম্বরে।
অঙ্গে তরুণ যৌবন শোভাশালী
মুখে শ্রমকণা, রক্ত কিরণমালী
শিরোপরি ঘটে স্বর্ণ শস্যডালি
আলপথে আসে যায়
উরুদেশ চমকায়
কটি শিহরায়
বৃষ্টি রৌদ্র হিমানী উজিয়ে আসা
শ্যামল বরণী নারী
চলে লঘুসঞ্চারী
অধরে ধরেছে একটিই কানপাশা।
কিন্তু দুদিনই সম্বল যৌবন,
স্বপ্নের শেষে অকূল বিস্মরণ,
দুঃখদীর্ণ দুর্দিন আসে নেমে
অকালে কখন যৌবন যায় থেমে,
তট থেকে ঘাস বয়ে যায় উন্মন
যে-লহরে স্মিতি খেলেছে কিছুক্ষণ।

ঐ দৃষ্টি

অন্ধকারের গুহার মতন ঘোর
ঐ দুই চোখ কাঁপায় আমার মন,
দূরাতিদূর ব্যাপ্ত দারুণ ওর
দৈন্য দুঃখ অ-রব ক্রন্দন।

নৈরাশ্যের অথৈ সম্মোহনে
শূন্যতা ওর একাকিত্বে রাজে,
মানব জনের পাশব নিপীড়নের
বিজ্ঞাপনী দেখেছি ওর মাঝে।

আতঙ্কের গভীর আলোড়নে
শোচন ক্ষোভ, শ্রান্তি, সংশয়
অন্ধকারে কাঁপায় ওর মন
শ্মশানে যেন লুপ্ত পরিচয়।

দর্শকের দৃষ্টি থেকে হায়
ঘোচায় দয়া ঐ অপরিজ্ঞাত
ভাসে যে ওর নিকষ অনিদ্রায়
জন জীবন চির জর্জরিত।

ঘুরে বেড়ায় দুঃস্মরণরত
চোখের কোলে অথির চোখের তারা—
লেঠেল এসে কষিয়েছিল লাঠি
যৌবনে করেছে সর্বহারা।

ছায়ার মতো ঘরণী সেও হায়
অসুখে ভুগে স্বর্গে গেছে চলে

দুধের শিশু কন্যা, অদর্শনে
দুদিন বাদে গিয়েছে তার কোলে
এবং ঘরে বিধবা বধূমাতা
লক্ষ্মী ছিল, যখন স্বামীহীন
স্বেচ্ছাচার করেছে কোতোয়াল,
কুয়োয় ডুবে মরেছে একদিন।

হারানো সুখ নয়ন প্রান্তিকে
ক্ষণপ্রভা জাগায় অকস্মাৎ,
শূন্যে হানে যেন তীক্ষ্ণ নাশা
অস্ত্র সম জাগায় সংঘাত।

অবচেতন সেই মুহূর্তে বুঝি
সুদূর এক দৃশ্য চোখে ভাসে
আলোছায়ার পর্দায় অঙ্কিত
যুগান্তর মানব ইতিহাসে।

অন্ধকারে গভীর গুহা সম
চকিত করে আমার দু'নয়ন।
স্তরবহুল সভ্যতাদেউলে
নিচুতলার ঐ যে বাতায়ন।

ঐ বৃদ্ধ

দরজায় দাঁড়িয়ে, যষ্টিভর
জীবনে ওর জরিষ্ণু পঞ্জর
সংকুচিত ত্বকে শুধুই হাড়
দেহখানির মাত্র-নির্ভর।

শিথিল নাসা শুষ্ক শিরাগুলি
কঙ্কালেই গিয়েছে সব ঠেকে,
পত্রঝরা পরাশ্রিত লতা
শূন্যময় তরুতে আছে বেঁকে।
দীর্ঘ ওর মূর্তির কাঠামো
কাঠের মতো যেন বা রয় খাড়া,
ধ্বংস পরে বিদ্যুতের মতো
সুপ্ত কোন্ যৌবনের সাড়া।

পঞ্জরাস্থি প্রোথিত ঐখানে
মেরুদণ্ড ন্যুব্জ বাঁশের মতো
নত উদর, ডেবে গিয়েছে ঘাড়
পায়ের নিচে শস্য বিচূর্ণিত!

বসে রয়েছে, মাটিতে রেখে মাথা,
আনতি যেন রাখে মাটির কাছে,
মাটি থেকে পা উঠিয়ে নিতে
ইচ্ছে জেগে ওঠে মনের মাঝে।

ন্যুব্জ জানু··· দীর্ঘিত চরণ
পরস্পর ঠেকেছে যেন এসে,
মাটিতে ঝুঁকে রয়েছে তার মাথা,
শুষ্ক মুখ নয়নে ওঠে ভেসে।

দু হাত জোড়া, বিস্তারিত মুঠি,
বিস্ফারিত গ্রন্থি অঙ্গুলি,
মৌন আর ত্রস্ত আঁখি দুটি
কহে নিজের ব্যথার ব্রজবুলি;
দারুণ খরা, শিরে গাত্রবাস
স্বল্পবাসে ঢাকে শরীরখানি
নিরাবৃতি; করুণ ঐ নর
বহন করছে অরণ্যানী।

তীব্র ক্ষুধা, পয়সা পেলেই খুশি
উঠে দাঁড়ায়, ঘরের দিকে যায়,
অকস্মাৎ দৃপ্ত জান্তব
চলার জোর লেগেছে যেন পায়ে।

নরকসম কলঙ্কিত ছায়া
ও যায় রেখে আমার ভিতরেই
পৈশাচিক দুঃখদুর্দশায়
মানুষ বুঝি ওর ভিতরে নেই॥

রজকরঙ্গ

রিনিকি ঝিনিকি ঝনন রণন
রিনিকি ঝিনিকি ঝনন রণন
ঠমকে ঠমকে গোপিনী আমার চুরি করে মন।

বাজে মৃদঙ্গ দ্রিমি দ্রিমি তালে
ডম্বরুতেও ডিমি ডিমি চলে,
গুঞ্জরে ধ্বনি মঞ্জরী তলে ;
ঝিম্ ধ'রে যায় রজকের যেন হোলির সকালে

ধনীর চরণে রণিত ঘুঙুর
কটিশিঞ্জিনী তরল মধুর
ফিরে ফিরে ও যে মাতে চঞ্চল
ঝনন রণন
ঠমকে ঠমকে গোপিনী আমার চুরি করে মন।

আঁচল কাঁপায় থর্ থর্ থর্
ওড়নায় লাগে লহরীশিহর
নিচোলে বক্ষ কাঁপে সকাতর
দেহবল্লীতে উঠেছে যে ঝড়;
শিঞ্জিনী তোলে কামনার স্বর
রিনিকি ঝিনিকি ঝনন রণন
মোহিনী গোপিনী চুরি করে মন
চতুর গোপিনী চুরি করে মন।

পল্লীশ্রী

দূর অবধি ফসলফলনখেত
কোমল ঘাসে সবুজ মখমল,
সূর্যকিরণ সেথায় অনুস্যূত
চন্দ্রজাল যেন বা উজ্জ্বল।

রোমাঞ্চিত লাগে বসুন্ধরা
সেজেছে যেন প্রকৃতির আভূষণে
স্বর্ণ ঝরে অঝোর অড়হরে
ভাগ্যরটে কিংকিনী নিক্কণে।
উড়ছে যেন কী মিষ্টি সুবাস
পীতবর্ণ সরস ফুলে ফুলে,
হরিদ্রাভ ধরিত্রীর গায়ে
নীলিম কলি, নীলচে তিসি দুলে।
হরেক রঙা ফুলের ঝিলিমিলি
মটরফুল হেসেই খিলিখিলি
মখমলের আস্তরণে বেশ
ঝোলানো শিম, মুক্তাবীজ নিলীন।

ফিরতেছে রং-বেরঙ পেরজাপতি
রং-বেরঙের ফুলে কী সুন্দর
ফুলের মধ্যে স্বয়ং ফেরে ফুল
বৃন্ত থেকে বৃন্তে নির্ভর।

রজত আর স্বর্ণ মঞ্জরীতে
আস্তৃত ঐ আম্রতরু শাখা,
মুকুল ঝরে, পিপুল মঞ্জরীও,
আর কোকিলের মাতাল হতে-থাকা।
কাঁঠাল সুবাস, জামের মুকুল জাগে,
অনামী কতো যে ফল জঙ্গলে
কতোরকম সব্জি আর ফুল
সচ্ছলতা পুষ্পে ও ফসলে।

রৌদ্রছায়াখচিত অলংকারে
হরিত-আভা ঐ যে লহরায়
আখের খেতে শুভ্র কাশফুল
নিশানখানি আনন্দে ওড়ায়।
অড়হরের উচল খেত জুড়ে
লুকোয় চুরোয় উতল-তরুণীরা,
চুম্বনের বদলে কীরকম
ভ্রমরুক্ষ জীবন খুশি করা।

মালঞ্চের ঈষৎ তরুচূড়ে
ঐ যে ঘের মায়াবী লাগে কতো,
কী সুন্দর গমের দানা জুড়ে
হিমকণিকা মোতির দানার মতো।
জগৎ হলো ভোরের আশ্রয়
ধরায় হেরো আকীর্ণ গগন
ছড়িয়ে আছে শিশিরকুজ্ঝটি
জাগর খেত, বাগান, গৃহ, বন।

স্মিত সবুজে শীতের রোদ্দুর
শয়ান রহে সুখের মোহাবেশে।

ভিজা-ভিজা অমাবস্যা রাত
তারা স্বপ্নে রয়েছে ঐ ভেসে।
মরকতের মঞ্জুষার পরে
নভোনীলিম ঐ যে আচ্ছাদন
উপমাহীন হেমন্ত-মাধুরী
নিজ শোভায় হরে সবার মন।

ভারত জননী

গ্রামে আছো ভারত জননী
খেতে ভরা আচ্ছন্ন শ্যামল
মৃত্তিকার মলিন আঁচল,
গঙ্গাযমুনার অশ্রুজল :
মাটির প্রতিমা উদাসিনী !

দৈন্য জাগে নমিত নয়নে
ওষ্ঠাধরে নীরব রোদন,
যুগান্তবাহিত খিন্ন মন,
আপন কুটিরে প্রবাসিনী !

ত্রিশ কোটি নগ্ন ছেলে, হায়
ক্ষুধার্ত, শোষিত, অসহায়
মূর্খ, দীন আছে অশিক্ষায়
আর তুমি নত নেত্রে হায়
আছে তরুতলনিবাসিনী।
স্বর্ণশস্য অপরলুণ্ঠিত,
সর্বসহা রয়েছো কুণ্ঠিত,
কান্না-কাঁপা ঠোঁট মৌন স্মিত
রাহুগ্রাসে সুচন্দ্রা হাসিনী।

পৃথ্বী রেখা তিমিরলাঞ্ছিত
নভোনেত্র বুঝি বাষ্পায়িত,

আনন্দচন্দ্রিমা ছায়াবৃত
জ্ঞানমূঢ়, গীতাপ্রকাশিনী !

সার্থক ও সাধনসংযম,
অহিংসা ও বুকে সুধাসম
হরে জনভয়, তমশ্রম
হে বিশ্বজননী উজ্জীবনী ।

দিনান্ত

সন্ধ্যা নিয়ে বৃতভানা পাখি
ছায় যতো বৃক্ষের শিখর
তাম্রপর্ণ পীতাভ, চঞ্চল
শতফুলে কনক নির্ঝর।

স্রোতে যেন জ্যোতিস্তম্ভ ছবি
প্রতিহত সূর্য ধরাতলে
শ্লথ এক বিশদ নির্মোক
বর্ণময় ভাগীরথী জলে।

নকশি-আঁকা ধূপছায়া তট
হাওয়া লাগে ঊর্মিতে সর্পিল,
নীল লহরীতে আলোড়িত
রৌপ্য মেঘ কতো সাবলীল।

সিকতা, সলিল, সমীরণে
স্নেহের মহিমা সমুজ্জ্বল,
বায়ুলীন সলিল যেন বা
কণা কণা বিদ্রব উপল।

শঙ্খ ঘণ্টা মন্দ্রিত মন্দিরে
লহরিত লয়ের কম্পন
দীপশিখা জ্যোতির কলস
আকাশে করিছে নীরাজন।

দূরায়ত তিমির রেখায়
চিত্রার্পিত উড্ডীন পাখায়
ওড়ে স্বর্ণবিহঙ্গের সারি
আর্দ্র স্বরে আকাশ ধ্বনিত।

স্বর্ণচূর্ণ গোধূলি উড্ডীন
কিরণের বাদল ধারায়
নদীতীর থেকে নভোপানে
উজ্জ্বল পাখির ধ্বনি ধায়।

হিমানীর শূন্যতায় ফোটে
নিশীথের প্রচ্ছায়া অমেয়—
ডুবে যায় নিষ্প্রভ বিষাদে
ঘর-মাঠ-তরু-তট-ঢেউ।

দোকানে দোকানে জ্বলে বাতি
বসে আছে শহুরে পসারী,
মৌন মৃদু আভার ভিতরে
হিমঘুম দীঘলবিসারী।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে আরো
টিনের চুল্লীটা, স্বল্প আলো
কাড়ে অবসাদ মন থেকে
চোখের সম্মুখে বোনে জাল।

ছোট্ট এক বস্তির ভিতরে
অর্থহীন বিনিময় সাধ,
আলোকচক্রের চারপাশে
সুখ আর দুঃখের মৌতাত।

কেঁপে ওঠে আসঙ্গকাতর
হৃদয়ের গভীর হতাশা,
ক্ষীণ জ্যোতি দেয় চুপে চুপে
গোপন মনের মূক ভাষা।

লীন হয়ে গেল মুহূর্তেই
মৃত্তিকার সংসার অঙ্গন,
বণিকের হলো বিস্মরণ
মুনফা অথবা মূলধন।

পণ্যের ব্যাপার স্তূপাকার
লাগে যেন বড়ো তুচ্ছতর,
প্রদোষের অরব আকুল
মন ঘোরে বাহির ও ঘর।

অনুভব করে ওর মন
অস্তিত্বের অনুপুঙ্খ স্বাদ,
জেগে ওঠে চিত্ত ভরে আজ
অসার্থক প্রাণের সংঘাত।

দৈন্য দুঃখ অপমান গ্লানি
অতৃপ্ত যতেক মৃত আশা
না-পাওয়ার অবসন্নতায়
জীবনের গূঢ় পরিভাষা।

পুঞ্জীভূত শস্যের মতন
একঠায় বসে দিনমান,
শুধু চলে অনৃতকথন
কানাকড়িটির অভিমান।

নগরের বণিকের মতো
হতে কি পারে না মহাজন ?
কে দিল সহসা রোধ ক'রে
ওর যতো জীবন সাধন ?

এখানে কেমন করে হয়
অবস্থার পরিবর্তন ?
কর্ম আর গুণের সমান
আয় ও ব্যয়ের বিতরণ ?

মাটির কুটিরে মানুষেরা
ভেবে মরে আপন আপন,
কেউ নেই সবার হৃদয়ে
ঢেলে দেবে সার্বিক জীবন ?

সম্মিলিত পৃথিবী রচনা
জীবনের সমবায়ী ভোগ,
শোষণবিমুক্ত জনগণ
সমাজের অধিকারী হোক ।

টুটে যায় স্বপ্ন বণিকের
আসে যেই বৃদ্ধা থতোমতো,
এসেছে আধপো আটা নিতে
আর বেনে প্রহারে উদ্যত ।

কোটরে চেঁচিয়ে ওঠে পেঁচা,
সকলেই রুদ্ধ করে দ্বার,
বস্তিটাকে খেয়ে নেয় গিলে
অজগর প্রগাঢ় নিদ্রার ।

দিবা স্বপ্ন

দিনের বিস্তৃত এই আভায় উদ্বেল তরী থেকে
দুপারের দৃশ্য জাগে অসাধারণের কান্তি লেগে।
আকাশ ফলক নীল, সৈকত রজতসমুজ্জ্বল,
গঙ্গার প্রবাহ যেন তরল বিলোল সৌধতল—
চপল বায়ুর স্পর্শে অহরহ হতেছে স্পন্দিত,
প্রশান্ত হাসির ছটা এ হৃদয় করে আনন্দিত।
মুক্তির উল্লাস তুলে জল ঘুরে যায় হেলেদুলে
নৃত্য করে ইত্যাকার পুলকিত তটসীমা ভুলে।

কিরণ রশ্মিতে খেলি লুকোচুরি খুশিতে উতল,
ফেনোর্মি-অঞ্চলতলে জেগে উঠি সুন্দর কৌতুকে,
কল কল হেসে উঠি উঠি, মত্ত নাচি নিরাবৃতি সুখে,
ঐ জল ভিজা নয়, দ্রব নভ ও বুঝি চঞ্চল
আমাদেরই আর্দ্র লাগে, স্বয়ং অনার্দ্র ঐ জল,
ছ্যাখো চিত্রার্পিত জাগে তৃণতরু ভূতলে বিস্মিত।
আমার চরণ চুমি ধরা বুঝি হল আলোড়িত,
এক সূর্য মহাকাশে, সে-ই পৃথ্বী পরে বিজড়িত,
শিহরে শিহরে বায়ু বিচলিত করে ভূমণ্ডল
নিশীথে ধরণী যবে হয়ে ওঠে নক্ষত্রখচিত
আমরাই স্বপ্ন দেখি স্বর্গলোক চন্দ্রালোকস্মিত।

জোয়ারে চলেছে ভেসে ক্ষীণ তরী গুণমাত্র ভর
মুহূর্তে বদল হয় চিত্রপট নয়নসুন্দর।

জলের ঝাপট লেগে চটুল শৈবাল যায় সরি
পাথার পরীর কাছে কে চাইবে পারানির কড়ি ?
বিদ্যুৎচমক ছায় উজ্জ্বল কলাপে দিগন্তর
শ্যামল মেঘের গায়ে ক্ষণে ক্ষণে বিজলী ভাস্বর
ওপারে তীরের পরে হেরো ওই সংলগ্ন তরুকে
দীঘল জটার মতো তির্যক হয়েছে বহির্মুখে।
সামনেই শুশুক ছাখো অবিকল পানকৌড়ি মতো
জলকে চমকে দিয়ে পাশ ফেরে কীরকম দ্রুত।
আর দুটি চখাচখি বালুকার আভায় উভয়ে
চঞ্চুতে মিতালি করে, খেলায় উল্লাসে সুখময়।
বসার উপায় নেই চক্রাকারে ঘোরে নিরন্তর
আর শাদা কালো দিয়ে ছায়া আঁকে জলের উপর।
ছাখো মাছরাঙা এসে নিচুভর হঠাৎ ছোঁ মেরে
ব্যস্ত মাছ নিয়ে গেল, আবার আকাশতলে ফেরে।
আর মানুষের মতো ঠোঁটে নিয়ে চায় বারবার,—
ব্যোমতলে উটপাখি ঘুরে যায় আর্তনাদসার
খয়েরি, কালো, হলুদ নানা রঙে চিত্রিত পর্দায়
বারবার স্মিত আভা যেন চমকায় ঝলকায়।
এখানে বাবলাশাখে টিলাপরে অলাবুর মতো,
ও এক বেতস-বাসা দুলে উঠে ছলকায় কতো
ওধারে একটু দূরে জঙ্গলের টিলা আছে হোথা,
দেখে মনে হয় বুঝি বাস করে অরণ্যদেবতা।
খেলে যায় ছায়া রৌদ্র, সুপবনে পল্লব মর্মর
বিজন প্রশান্তি নিয়ে স্বপ্ন ছাখে মৌন দ্বিপ্রহর।
বনের পরীর দল ধূপছায়া রঙের শাড়ি পরে
ঘুরে ঘুরে যায় নানা ঋতুফুল সংকলন করে।
ওখানে মাতায় মন নব নব মুকুল উন্মন,
গুঞ্জিত সতত ঐ বৃক্ষে যেন সবুজ স্পন্দন।

ওখানে কাঠবেড়ালি ডালে ডালে ছুটে ছুটে যায়
চঞ্চল ঢেউয়ের মতো, রোমপুচ্ছ কেমন কাঁপায়।
বন্য বিহঙ্গের মতো মন কেড়ে নেওয়া প্রিয় স্বর
গীতবাদিত্রের ছলে মুগ্ধ করে শোকার্ত অন্তর…
ওখানেই কোনোখানে মনে করি পালাই লুকিয়ে
মানুষের পৃথিবীর পরিতাপ থেকে ছুটি নিয়ে
প্রকৃতির নীড়ে গিয়ে আকাশপাখির গাই গান
স্নেহাতুর হৃদয়ের যন্ত্রণার করি অবসান!

১৯৪০

সমরভূমিতে মানবশোণিতরঞ্জিত দৃঢ় পায়ে
নন্দিত হয়ে প্রলয় কামান গর্জন বন্যায়
নববর্ষের আগমনে ঐ আন্দোলনের সাড়া
বৃহৎ বিমান পাখায় ঝরায় বিষবহ্নির ধারা।
এদিকে অটুট সাম্রাজ্যবাদ বিনষ্টি প্রয়োজন
ওদিকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় যুদ্ধ নিমন্ত্রণ।
ন্যায়ের পোশাকে সত্যলুব্ধ লড়ছে রাষ্ট্র যতো
সিন্ধুলহরে ক্রয়বিক্রয়···ঐ নর্তনরত।
ধূ ধূ বাষ্পের বেগ, বিদ্যুতে দীর্ণ দিগন্তর
ধ্বংস ভ্রংশ করে জর্জর ধনসভ্যতাগড়···
শ্রেণীসংগ্রামে গণজনতার ভাগ্য লোকোত্তর
রামধনু সেতু নতুন শোভিত প্রলয় মেঘের পর
বিশ শতকের বিজ্ঞান আজ উত্তরযৌবন
নিয়ে এসো নববর্ষ অমোঘ, বিনাশে নবসৃজন।

বাণী

তুমি জনমনে সুবহন করো আমার নববিচার,
কী অলংকার প্রয়োজন তোর, ওরে ও বাণী আমার।
ধরণীর কাজ আজ এ যুগের নির্বেদে জর্জর,
গণঐক্যেই নতুন যুগের অমোঘ রূপান্তর ;
তুমি বন্ধনমুক্ত নতুন শব্দের অভিঘাতে
পারে তো সুদূর মনোনভ জুড়ে জনশক্তি জাগাতে ,
কী অলংকার প্রয়োজন তোর ওরে ও বাণী আমার।

চিত্তশূন্য আজকে পৃথিবী, গাও গুঞ্জিত স্বরে,
জড়মন হানো নতুন স্থিতির জাগৃতি মন্তরে।
জড়চেতনার দুই পারে তুমি করে চলো পারাপার,
করো ঝংকৃত ভবিষ্যতের সত্যের স্বরাকার,
কী অলংকার প্রয়োজন তোর ওরে ও বাণী আমার।

যুগের কর্মে, যুগরূপ বাণী যুগসত্যার্পিত
শব্দিত করো ভাবী সহস্র শত শকাব্দ যতো।
আলোকিত করো জনমানসের জীবন অন্ধকার
তুমি খুলে দাও মানবহৃদির শব্দহীন দুয়ার···
কী অলংকার প্রয়োজন তোর ওরে ও বাণী আমার।

হিমাদ্রি

ধরিত্রীর অখণ্ড ভূ-মানদণ্ড তুমি,
পুণ্যমৃত্তিকার ঐ স্বর্গআরোহণ।
সুপ্রিয় হিমাদ্রি তব হিমকণিকায়
ঘিরেছ আমার ইহজীবনের ক্ষণ।

তুমি যে অঞ্চলবাসী আমার আশাকে
শৈশব মুহূর্ত থেকে করেছো পাবন,...
আকাশে নয়ন রেখে, তোমার কল্যাণে
স্বপ্নের সুচরিতার্থ পরম জীবন
সৃজনের কবে থেকে শব্দের শিখরে
হিমাদ্রি করতে তুমি চেয়েছো চিত্রিত
শুভ্র প্রশান্তির রঙে সমাধিস্থ ওগো
চিরায়ত সৌন্দর্যের মহান ভূভৃৎ...।

শৈশবচেতনা মোর তোমার ভিতরে
স্তব্ধীভূত আনন্দে রয়েছে তরংগিত,
চেয়ে চেয়ে দেখি তব সৌন্দর্য সাধনা
আর মন হয়ে ওঠে অপার বিস্মিত।
এবং শিখরশীর্ষে হিরণকিরণ
জ্যোতির উষ্ণীষে করে অলংকারস্মিত।
যার পরে অকস্মাৎ স্খলিত তড়িত
নিজের আলোয় নিজে হয় উচ্চকিত।
এবং শিখরে যার রজত পূর্ণিমা
সিন্ধুর জোয়ার যেন হয়েছে স্তম্ভিত।

যার নীরবতা পরে যেন বা আমার
গীত আর স্বপ্নরাগ হতেছে ঝংকৃত।

জীবন উদধি তটে আজ আমি আছি
খাড়া অবাঞ্ছিত, লুব্ধ, খুব উপেক্ষিত,
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি ক্ষুদ্র অহংয়ের
শিখরিত তরঙ্গের সংগ্রাম কুৎসিৎ।
ভেবে মরি কোন্ সে সত্তার গরিমায়
আমার অন্তর-আত্মা হয়েছে নির্মিত,
সুপ্রিয় হিমাদ্রি, পরিশেষে মনে হয়
আমার শিক্ষক তুমি হে অপরিচিত।
শুধাই মনের কাছে, সে-কোন্ উপায়ে
বসুন্ধরা কী করে বা রইত জীবিত
তুমি যদি স্বর্গায়িত মহিমা ভূতলে
বরিষণ না করিতে অঝোর অমিত।
শিখরে শিখরে উঠে করে দাও তুমি
মানব-আত্মার এই আধার দীপিত।
অসীম চিন্ময় এক দিব্য অনুভবে
অবলীন জ্যোতিশৃঙ্গমণ্ডিত ভূভৃৎ।

ঘনীভূত অধ্যাত্ম তত্ত্বের আয়োজনে
যার জ্যোতি শতধারে হতেছে নিঃসৃত।
প্রাণের সবুজ রঙ্গে এই যে সুস্মিত
বসুন্ধরা তোমারি তো মহিমামণ্ডিত।
স্ফটিক সৌধের পরে শ্রীমন্ত সুষমা
শৃঙ্গে শৃঙ্গে রশ্মি রেখা হয়েছে কল্পিত।
স্বর্গ খণ্ড তুমি এই বসুধার পরে
প্রাণিত পুণ্যের তীর্থ, দেব প্রতিষ্ঠিত!

উষা

(মনঃস্বর্গ)

হেরো ঐ বিশ্বের উদিতি
হিরণকলস বক্ষে ধরি
অর্ধমুক্ত জ্যোতির তোরণে
জলদর্চি নিবেদন করি।
অভিষিক্ত পবিত্র আভায়
সদ্যঃস্ফুট শোভায় সংবৃত,
মন্দিরে অরুণোদয় আজ
প্রকাশের পথ উন্মীলিত।
আননে লাবণ্য অগুণ্ঠিত
প্রীতিদিঠি আলোকস্তিমিত।
দিব্য চেতনায় দীপ্ত উষা
অধরপল্লব প্রভাস্মিত।

জ্যোতিনীড়ে পাখি বিশ্ব, গায় নব জীবনমঙ্গল—
বাতাসে রুপালি ঘণ্টা বেজে যায়, আর তরুদল
তালি দেয়, চুমায় বিকচ পদ্ম, গুঞ্জিত মৌমাছি।
নৃত্যতবঙ্গিত স্রোত, মাটিতে নূপুর যায় বাজি।
হিমকণা হাসিঝুরি কিরণপূরিত দিব্য ক্ষণ,
কম্পিত তৃণ পুলকে দীপ্তি পায় বালুর জীবন।
ধরার উরোজ ব্যক্ত, শিখরে বহিছে সমীরণ
সরিতের জঙ্ঘাদেশে জলের রেশ্‌মি আবরণ।
স্বর্গবিভা মর্ত ছুঁয়ে রূপান্তরে হয় সুরঞ্জন :
জ্যোতি ও তামস মিলে বিশ্বের এ এক সন্ধিক্ষণ।

সুচেতনা হৃদয়ের অনুরাগ করে যায় স্মিত।
জীবনবৈভবে আজ ধরাতল হল কুসুমিত।

ফুলের লাবণি জাগে খুলে যায় মাটির উচ্ছ্বাস।
ভ্রমর গুঞ্জরে, কেকা চৌদিকে রটায় মধুমাস,
স্পন্দিত প্রবালে দীপ্ত রুপালি সবুজ দিগ্বলয়ে
গীতগন্ধ মকরন্দ হিমস্নিগ্ধ সমীরণ বয়।
মন্দ্র কোন্ গীতিনাট্য ধ্বনিত হতেছে সব দিকে,
অনন্ত নীলিমা কাঁপে তরঙ্গিত সৃজনী আঙ্গিকে।
অলঙ্ঘ্য শিখরশৈল চিত্রার্পিত শান্তি দেয় লিখে।

মাটিতে লহর তুলে ব্রীড়া কাঁপে উষার আননে
সংরাগে সমস্ত শিরা কেঁপে ওঠে তীব্র আলোড়নে
অধরপল্লবে জাগে মধুময় হিরণমর্মর
মৌন মুকুলিত মুখ রক্তরাগ কাঁপায় সুন্দর।
কী ছিল পার্বত্য কুঞ্জে, তটপরে সরিত গোপন,
হৃদয় নিহিত লজ্জা হল এক অমর্ত্য কিরণ!
সলজ্জ মুকুলে ছাওয়া ধরিত্রীর আননগুণ্ঠন,
সংরাগমদিরাপানে জেগে ওঠে স্বর্গের চেতন।

তাপসী সহসা বুঝি নওল মুকুলে অলংকৃত,
রঙ্গভরা মধুমাসে উরোবাস রয়েছে সংবৃত,
পায়ের ছোঁয়ায় লতা সাড়া পেয়ে ভ্রমরগুঞ্জিত
স্বর্ণমঞ্জরিত কটি, কাঞ্চীদাম কেকামুখরিত।

অমরচরণস্পন্দ অনুরাগে মৃত্যু চেতনায়
পরম অহং জাগে, চৈতন্য, সৃজন তপোময়
ভাবজীবনের স্বপ্ন করে তোলে একাগ্র সংহত
আত্মার ঐশ্বর্যে কাঁপে ভাবের মোহিনী মায়া যত।

তুহিনকণায় গড়া উষ্ণীষে জেগেছে ওকি সুখ···
চলেছে চলোর্মিপরে, কিরণে রহস্যাবৃত মুখ।
স্রোতে জাগে মুক্তারাশি, তরুদলে কাঞ্চন মর্মর,
রুপালি অঙ্গুলি দেয় পুলকিত স্পর্শের শিহর।
ঝংকৃত বুকের শিরা, নিমেষেই হয়েছে চঞ্চল,
সৌন্দর্য অঞ্চল ধরে ওই ত্যাখো ছুঁয়েছে ভূতল।
রোমকূপে বিদ্যুৎসঞ্চার, শ্বাসে বিস্মৃতি মাদন,
প্রীতির স্বর্ণিম সুরা এনেছে এ কোন্ সঞ্জীবন!

আর ঐ এল আশা, চন্দ্রের রুপালি তরী বেয়ে,
উধাও মেঘের ঘর স্বর্ণময় হাস্যে দেয় ছেয়ে
গীতিস্বপ্নে ছাওয়া ঐ বিষ্ণু দেবতার আস্তরণে
চপল বিদ্যুৎ ছায় শিহরায় হৃদয় হর্ষণে।
রজত পল্লবে দ্যুতি ঘিরে আছে প্রিয় দেহখানি
সমুদ্র জোয়ারে ভাসে ফেনোর্মিশিখরে মুদ্রা হানি
চির অর্ধবৃত বক্ষে জ্বলে জ্বলে ওঠে তারাবলী
রজঃস্বল অভ্রপুঞ্জে মর্তের বালুকা ওঠে ঝলি।
শরৎ পূর্ণিমা স্নাত মল্লিকার মতন অমল
হিম বাষ্প কণিকার আবরণে কিরণ উজ্জ্বল,
শৈশবসুখের মত প্রতীতি এল যে চিরারত,
অনভ্র নীলিমা তার অতল নয়নে বিস্তারিত।
স্বর্গসুধা নিয়ে ইন্দু রশ্মি ঘটে হিমকণস্মিত,
আগুন করেছে ওর হৃদয়েরে বিচ্ছেদ পীড়িত,
দশনের আভা তার সুস্মিত হৃদয়ে বিকীরিত।
প্রাণ যেন কোমল মৃণালতন্তু দিয়ে সুরচিত।

জোনাকিমণ্ডলে ঘেরা মুখের উপরে শান্তি রাজে
তারার সরসী সম স্মিত স্বপ্ন জাগে চিত্ত মাঝে,

ইন্দুলীন শরতের মেঘ থেকে বাষ্পের শরীর
সজল করুণা আঁকে মেঘখানি ছিল গোধূলির,
আকুল অতল নীল নয়নের দ্রবিত নীহার
সফেন অশ্রুতে মূর্ত স্তনের স্পন্দিত পদ্মভার,
আর্দ্র সুরভিত শ্বাস, স্মিত শেফালিকা হিমধারে
মাটিতে চরণ শব্দ শুনে ধারা ঝংকারে ঝংকারে।

সহচরী ছিল ক্ষমা দীপ্তি রশ্মি চুম্বিত ভাল
যুগ্ম বুকে অমৃত জ্যোতিকলস স্পন্দিত বিশাল
ন্যায়ের আশ্রয়ে মুখে চুমা দেয় বিলোল কুন্তল,
দৃষ্টিপানে পাখা মেলে শ্বেত শুভ্র রুপালি মরাল।
দীপিত অঙ্গুলি কাঁপে বরদ মুদ্রায় সাবলীল,
অধর চুম্বন করে সুরা হলো সুধার সামিল,
স্পর্শ পেয়ে সুখের পুলকে হাসে বেদনার ভার,
মর্তেছিল স্বর্গাবধি নয়নের নীলিমা বিশাল।

শ্রদ্ধা এসেছিল আভা ভিতরনয়ন ব্যক্ত করে,
হৃদয়ের সুরভি নির্যাসে, প্রিয় দেহখানি গড়ে,
আশিস রশ্মির বৃষ্টি ছিল যেন স্বর্গীয় চাহনি,
রুপালি শিশির শান্তি ছাওয়া সেই বরাননখানি,
মাটির প্রদীপশিখা উর্ধ্বায়ত ছিল স্বর্গপানে
…নিবাত নিষ্কম্প যেন কিরণ স্তম্ভের উর্ধ্বায়নে,
সূক্ষ্ম যে চেতনা ছিল সিন্ধুর মন্থনে স্বতোদ্ভাস,
হৃদয় উদয়াচলে শুভ্র ঊষা প্রতিম প্রকাশ।

ভক্তি ছিল রোমাঞ্চিত যেন এক পুষ্পিত অনল
নয়নের অভ্র ঝরা অজস্র প্রকাশে অনর্গল,
অধর তটের পরে প্রবাহিত খুশির প্লাবন
হৃদয় কম্পনে বাজা পায়ের নূপুর প্রতিক্ষণ,

আতপ্ত কনকদ্যুতি দেহময় সহজ চন্দন,
উরোজ গৈরিক শৃঙ্গ ছিল অশ্রুর করুণ মাল্যোস্মিত,
সিত কর্পূরের চূড়া, দিব্য এক শিখায় দীপিত,
সন্ধ্যাপদ্ম সম ধ্যানমগ্ন হিয়া প্রেমিকে অর্পিত।

গুহায় আরক্তদীপ, সৃষ্টিখানি করে সচকিত,
জলদর্চি ও প্রতিমা অবিরল তড়িতস্ফুরিত,
মানস লহর ছুটে আলোক স্বয়ং চমকিত,
রঙিন পাখির মতো উড্ডীন কাকলি উচ্চারিত,
বাহু বর্ণময় বিভা বিদ্রব ছড়ানো দেহলীন,
চপল শিহরভরা প্রিয় সখা চাঁদের হরিণ,
অর্পিত সুরভি সম হাওয়া ছিল ডানায় উড্ডীন,
দিব্য প্রেরণার রশ্মি জালায়নে মুখ অন্তর্লীন,
শ্রেয়সী মুক্তি ও সত্য অবতীর্ণ হলো সব শেষে
সৃষ্টির পদ্মের মতো মুক্তি গেল দশদিকে ভেসে;
অবন্ধ বন্ধনে ওযে সব কিছু বেঁধেছে আশ্লেষে,
সূক্ষ্ম বাষ্প থেকে ছিল, হিম থেকে বাষ্প ছায় এসে,
মুক্তিপদ্মে রাখা ছিল আলোকিত সত্যের চরণ।
সুস্মিত আনন থেকে সরে গেল হিরণ গুণ্ঠন,
আত্মপর একাকার পৃথিবীর জড় ও চেতনা
সত্য হয়ে গেল আর সত্য হলো প্রতি বালুকণা।

এইভাবে চিরায়ত স্বর্গীয় চেতনা প্রতিষ্ঠিত
জীবনের শতদলে, দেবতার হৃদয়ে ভূষিত
জড় ধরিত্রীর তাপ, শাপ দুঃখ দৈন্য ও বেদন
কাকের পাখার মতো তামসে বিলুপ্ত অচেতন॥

কাকের বিষয়

নগ্ন তরু তলে তুমি বসে আছো সুন্দর ধরণে
মেহগনিগড়া গৃধ্র পার্শ্বমুখ সন্ধ্যার গগনে,
অমাবস্যায় জন্ম গাছের কোটরে নভশ্চর,
পাতার ছাউনি দিয়ে নক্ষত্রের ব্যঞ্জনা ভাস্বর।
পাখার উড়ানি শাম্‌লা কুঞ্চিত সরল, অঙ্গভার,
তোমার উপরে নেই সামান্য প্রভাব শুভ্রতার।
গ্রহণ করো না বর্ণ যতি ব্রতী আছো তুমি ঠিক
তোমাকেই প্রশ্ন করি, জানি তুমি প্রজ্ঞার প্রতীক
বিখ্যাত ভাবিকথক, প্রেমদূত, কবির কীর্তিত
সুবর্ণচঞ্চুতে কাক বারবার তুমি পুরস্কৃত,
বলো তুমি জগতের দৈন্য কেন, কী এর উত্তর ?
কালিমাকলুষ বুঝি তোমার একান্ত সহচর ?

তোমার প্রাচীন মিত্র বিশ্বামিত্র, দিনার্ত বাহুড়,
হে তাপস, জাগ্রত সমস্ত রাত সেবক তরুর।
ঈষৎ হেলাও ঘাড়, বিস্মিত, একটু বা দুর্ভাবিত
এক চক্ষু উল্‌টে আর অন্য চোখ কোটরে গচ্ছিত,
হে মুখরভাষী দাও সাফ সাফ প্রশ্নের উত্তর
মহত্ত্ব সে-ই কি নয় লোকজীবনের সুনির্ভর ?
গ্রাম্য ঢঙে বলে কাক কাও-কাও নিশ্চিত প্রস্বরে,
কামনা, কামনা তবে দুঃখের কারণ চরাচরে।

আমিও শুধাই, জানি কামনাপীড়িত এই ধরা
কিন্তু কার সাধ্য বলো অজেয় কামনা জয় করা ?

পক্ষপাতে ওড়ে পাখি, মন ভরে অসিত প্রকাশে,
আমার ত্রাসের সব সদুত্তর ওর তমোবাসে।
পক্ষপাত কামনার অন্যনাম, শোকের কারণ
সব মূর্তি নয় দীপ্ত, কালো নয় তিমির গহন,
এই প্রকাশের শিখিপুচ্ছে রূপ অরূপ নিশ্চয়
ওতে মানুষের মন লোভ স্বার্থ হিতার্থে তন্ময়।

অন্ধকার ধরে নানা রূপ, ঘন ইন্দ্রধনু মেঘে
এ মাটি উর্বর কালো কোকিলের স্বর ওঠে জেগে।
জ্যোতিহংস আর কালো কাক থেকে যে রহে পৃথক
সর্বগত ঐ কেন্দ্রে মানুষের অন্তর সার্থক,
হংস আছে এ জগতে, বায়স ময়ূর পরস্পর
সমস্তের পাশে আছে অপাপ ও স্থিতপ্রজ্ঞ নর,
শাদায় কালোয় মিলে বর্ণময় জীবনের পথ,
মানুষ অপক্ষপাতে জীবনকল্যাণে হোক রত,
পরভৃতের চিত্তে কালো আর আলো অনিমিখা
দীপতলে অন্ধকার ছায়াপাখি, তুমি দীপশিখা।

স্বর্ণধূলি

বলো কে ঝরালো স্বর্ণবালুকা ধরার মরুস্থলে,
আলেয়া-সিকতা নিয়ে স্বর্ণিম স্বর্গীয় আভা জ্বলে।
কী জানি কখন মিশেছ ধরার ধূলিতে স্বর্ণধূলি,
জীবনজ্বালায় বুলাও তোমার নবজীবনের তুলি।

আঁধার গুহায় হেসে ওঠে যেন বিস্তৃত জ্যোতিজাল,
হেমমুহূর্তে রজতউর্মি ছুটে চলে এই কাল,
খণ্ডিত সব পূর্ণতা পায়, অচেনাকে লাগে চেনা,
নামরূপ সব একাকার করে হিরণ্য সুচেতনা।

চোখ-বাক-মন-শ্রবণ সূর্য-অগ্নি চন্দ্র দিক
হয়ে ওঠে, রূপ গন্ধ শব্দ রসে হিয়া ঝিকমিক,
চিন্ময়ী বীণা মানুষীর মতো ঝংকৃত প্রস্বরে
আত্মা নবীন যুগপুরুষের উৎসর্জন করে।

জনমনে নব আলোকের বীজ স্বর্ণধূলির কণা,
মুকুলে কি রয় অন্ধ ধরার নব রণোন্মাদনা ?
আঁধার ধরায় চীরবাসে সোনা রশ্মি নবাংকুর,
মানস স্বর্ণপরাগে ধরার রূপান্তরের সুর।

শ্যামল বাদল

শুনেছে এবং দেখেছে আমার মন,
শ্যামল বাদলে নিহিত শশিকিরণ
শ্যামল বাদল জাতিবিদ্বেষে, আর
শ্যামল বাদল ত্রিতাপযন্ত্রণার
শ্যামল বাদল রূপান্তরের পথে
নবীন তোরণদ্বার,
শুনেছে এবং দেখেছে আমার মন
শ্যামল বাদলে নিহিত শশিকিরণ।

আজ দিগন্তে গহীন আঁধার ছায়
রণভেরী ঐ নীলিমায় গর্জায়,
বিদ্যুৎ ওঠে চমকে ক্ষণে ক্ষণে
ঝনন রণন ঝিল্লির গুঞ্জনে,
ময়ূর ময়ূরী স্পন্দিত অঙ্গন
শ্যামল বাদলে নিহিত শশি কিরণ।

শ্যামল বাদল, শ্যামল বাদলজল,
আমার হৃদয় হলে আজ চঞ্চল
সে কোন হৃদয়ে শঙ্কিত অনুপল
রণসজ্জিত মৃত্যুর দলবল
আগুন, আঘাত, নিয়তির আয়োজন:
শ্যামল বাদলে নিহিত শশিকিরণ।

আমার হৃদয়ে নেই তো মৃত্যুভয়
অকল্যাণেও প্রীতি নেই নিশ্চয়,
মানুষের প্রতি না যদি রহে প্রতীতি
জানি সেও নয় মানবিকতার রীতি।
দেশ ও জাতির নবজীবনের লেখা
শ্যামল বাদলে আগামী কনক রেখা।

জাতিস্বার্থ

ওরা ওখানে লড়ছে, তুমি কিন্তু লড়াই লড়ছোনা
ওরা এখানে শরীর ছিন্ন করছে, তুমি কাঁটাছেঁড়া করছো ন
হে সুচিরমৃত, চিরজীবিত মানুষ।

অন্ধ প্রথাগুলি দাবি জানায়, তুমি কিন্তু পারো না
শুকনো ডাল ওরা ছেঁটে দেয়, তুমি ছেঁটে নিতে জানো না,
জীবন্মৃত হে নবজীবিত মানুষ।

যাবার আগে তুমি এখানে এসেছো
এই স্বর্ণধরণীতে,
মৃত্যুর আগেই তুমি নিয়েছো নবজন্ম,
তুমি ধন্য, হে আগামী দিনের নরনারী।

তুমি অন্ধকারকে ছিন্ন করছো,
মৃত আদর্শকেও,
যুগমানবের সংঘর্ষে সংকুল
নতুন চেতনায় নিমগ্ন আছো তুমি।

প্রেতযোনিমুক্ত ভবিষ্যতের হিরণ্যসময়ে
তুমি জীবনের রথ টানো, নতুন মানুষ
পথে বৃষ্টি, শত আশার
    শতেক হর্ষের।

সেই আশ্রয়বন্ধে কোন দেহ-হনন নেই,
আজ তুমি উৎসর্গের সেই পশুকে কাটছো
যার নাম যুগযুগসঞ্চিত বৈষম্য জাতিস্বার্থ।
এবমস্তু বহিরন্তর
    যা তুমি আজ ছেঁটে দিচ্ছো।

মৃত্যুঞ্জয়

ঈশ্বরকে মৃত্যুবরণ করতে দাও,
তিনি পুনরুজ্জীবিত হবেন,
ক্ষণে ক্ষণে ওঁর মৃত্যু আর জীবন—
ঈশ্বরকে নতুন নতুন রূপে নিতে দাও।

শতরূপে, শত নামে, শত শত দেশে
শত সহস্র বলে এঁকে সৃজন করতে দাও।
ক্ষণ-অনুভূতির জয়-পরাজয় জন্ম-মৃত্যু
লাভক্ষতির আবর্তের মধ্য দিয়ে এঁকে উত্তীর্ণ হতে দাও,
ঈশ্বরকে মৃত্যুবরণ করতে দাও।

তিনি শরীর, জীবন বা জনগণ থেকে
দূরে দাঁড়িয়ে নেই।
বিদ্বেষ কলহের অন্তঃস্থ পর্যায়ে
অন্ধকার আর প্রকাশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে
তিনি বেড়ে উঠছেন, অহরহ বিশ্বাসের
আপন দিব্য নিয়মে।
দূরে দাঁড়িয়ে নেই তিনি
শরীর, জীবন, জনগণ থেকে।

একদৃষ্টিতে, একরূপে, আমরা দেখি ঐ
ভূমাকে, জগৎ বা জীবনকে,
ওর মধ্যে সুখদুঃখ, জরামৃত্যু জড়চেতন
শান্তি সংঘর্ষ—ও যেন দ্বন্দ্বের আধার।

পরম দৃষ্টিতে, পরমরূপে ঈশ্বর—
অজরামর, এক—অনেক, সর্বগ, অক্ষর,
ব্যক্তি, বিশ্ব, জড, স্থূল, সূক্ষ্মতর।

স প্রত্যাগাৎ শুক্রমকায়ব্রণম্
অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্
কবির্মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভু—পূর্ণ পরাৎপর

তাহলে ঈশ্বরকে মৃত্যুবরণ কবতে দাও,
পুনরুজ্জীবন যার তাঁকে মৃত্যুববণ করতে দাও।
বারংবার মৃত্যু ও জীবনের মধ্য
ঈশ্ববকে চিরমুক্ত সৃজনব্রতে নামতে দাও।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

একবার ফিরে এসো কবি, এই বিধুর স্বদেশে
তোমার কথায় দাও বাঁচবার নতুন আশ্বাস !
অগণ্য মানুষ আছে এখন তোমার প্রতীক্ষায়,
হে বাণীর বরপুত্র, ধরণীর বিনষ্টি ঘোচাও
অমর তোমার স্বরে, বিশ্বকে নবজীবন দাও।
এসো তুমি আরবার ভারতমানস থেকে আজ
দূর করো অবনত ঘৃণিত সে মধ্যযুগপাশ,
নতুন চেতনা আনো উদ্ভাসিত কনকদর্পণে
বিশ্বের সকাশে নব জীবন ও মানবতা নব
উজ্জ্বল মুখাবয়বে তার মাঝে হোক মুকুরিত।
এসো তুমি, জীবনের অভিনব বসন্তের পাখি
সুস্মিত চৈতন্যে হোক বিশ্বসংস্কৃতির স্বর্ণোদয়।

১৫ই অগস্ট ১৯৪৭

চির-প্রণম্য এই পুষ্যাহ, জয়গান গাও অমরগণ,
ধরণীর পরে হেরো আজ নব-চেতনা করেছে অবতরণ!
শতেক যুগের তিমিরাবরণ ছিঁড়ে ফেলে আজ নব ভারত
নবারুণ-সম ভুবনে ভুবনে ছড়িয়ে দিয়েছে আলোর স্রোত!
দেখ ধরা আজ জ্ঞানপ্রদীপিত, সভ্য ধরার লোকজীবন,
ভারতের সাথে টুটে গেছে আজ জগতেরও জড়তা-বন্ধন!

আজ অবসান শতেক যুগের জাগতিক সংঘর্ষ যত
শোনো ভারতের মুক্ত চেতনা এ বাণী ঘোষণা করে নিরত
নিয়ে এসো শুচি আমের মউল, স্তম্ভ বানাও কদলীগাছে,
পাবন গঙ্গাজলে ভরে তোলো মঙ্গলঘট পূজার কাজে
নব অশোকের পাতায় পাতায় বেঁধে তোলা উঁচু তোরণদ্বার,
গাও জয়গান ভারতের, গাও জয়গান এই স্বাধীনতার।
চন্দ্রকলায় স্মিত হিমাচল যেন আজ আরও সমুন্নত
চিরসমাধির থেকে জাগরিত তপোদ্ভাসিত যোগব্রত!
লহরে লহরে ইন্দ্রধনুর ধ্বজায় শিহরি কম্প্র হাত
সুখবিহ্বল সমুদ্রজল সোচ্ছ্বাসে করে জয়নিনাদ।

ধন্য আজি এ মুক্তি দিবস, জনমঙ্গল গাহো সকলে,
ভারতলক্ষ্মী আসীনা আবার ভারতের শতদল কমলে
জয় মহাত্মা গান্ধীর, দিক ধ্বনিয়া বেড়াও তুমুল জয়ে
জেনো তিনি এই নব ভারতের স্রষ্টা সারথি অসংশয়ে
হে ভারতবাসী, দেশনেতাদের পুনরায় করো অভিবাদন
জীর্ণ জাতির অন্তরে যাঁরা ভরে তুলেছেন নবজীবন

হে যুবতিজন, ধরণীর বেণী স্বর্ণ-শস্যে বিনাও ফের,
বীব যুবা, হও বজ্রপ্রাচীর স্বয়ং তোমরা এ রাষ্ট্রের,
ভারতের লোকজীবন সে হোক লৌহসমান সংগঠিত,
নগ্ন ভগ্ন ক্ষুধাতুর হোক সম্পদশালী সুশিক্ষিত,
মুক্তি কখনো হয় না পালিত সিঞ্চিত হয়ে নয়নজল
সে শোষিত হয় সংযম আর ধ্যানের শোণিত-স্বেদে কেবল
মুক্তি সে মাগে কর্ম বচন মন প্রাণ করো সমর্পিত,
হে বীব যুবাবা বৃদ্ধ দেশেরে যৌবন দাও অকুণ্ঠিত।

এ নব স্বাধীন ভারত সে হোক জগহিত-জ্যোতি জাগরণের
নবীন প্রভাতে ধরার আঙিনা স্বর্ণগাহনে ভিজুক ফেব
হোক জাগ্রত জনগণমনে নবজীবনের যত বিভব
মানুষের মনে নামিয়া আসুক আত্মার ঐশ্বর্য সব ,
রক্ত-সিক্ত ধবণীর হোক অবসান সব দুঃস্বপন
শান্তি প্রীতি ও সুখে এই ধবা হোক দেবলোক সুর-মোহন ;
ভারতের পরাধীনতা ছিল সে বিশ্বমনেরই পরাধীনতা—
আজ প্রসারিয়া গেছে সীমা, গেল ঘুচে জগতের বাঁধনব্যথা।
ধন্য আজি এ মুক্তি দিবস, লোকজাগরণ তিমিরনাশী
নতুন সংস্কৃতির আলোক বিতরিছে ঐ ভারতবাসী,
নবজীবনেব কিরণে দীপিত হোক দশদিশা চিরপ্রহর
মুকুলিত নব মানবতাবোধে হোক এ ধবণী প্রভাস্বর ।

শ্রাবণ

ঝম ঝম ঝম শ্রাবণের মেঘ ঢালে ধারাসার,
ছম ছম গাছে ছাঁকা হয়ে নামে জলভার তার !
চম চম ঝলে বিজুরি-চমক মেঘের মাঝারে,
থেকে থেকে জাগে স্বপ্ন হৃদয়ে দিনের আঁধারে !
আসেনি কখনো বরিষা এমন পাগলের পারা,
অঝোর ধারায় ঝরে যায় শুধু জলের ফোয়ারা !
শোঁ-শোঁ করে ঝড়, বনে মর্মর, গাছে গাছে ধ্বনি,
সারাটা পক্ষ দিবানিশি নেই শশি-দিনমণি !

পাখিদের মতো ডানা মেলে আছে দূর তালীবন,
লম্বা আঙুল, চ্যাটালো হাতের পাতার গড়ন ;
তোড়ে ঝরে সেই বরষা তাদের সকল শরীরে,
হাতের আঙুল গলে ঝলমল নামে তারা ধীরে !
নাচে তালি দিয়ে মাতাল যেন সে চল-তালদল,
ঢুলে ঢুলে মাথা নাড়ে নিমগাছ সুখবিহ্বল !
ঝরে পারিজাত, বেল-কুঁড়িগুলি পলে পলে বাড়ে,
পাখিদল গায় মঙ্গল সেই সবুজোৎসারে !

দাদুরি সঘনে ডাকে, বেজে যায় ঝিল্লি-ঝনন,
কেকা ডাকে পিক, পিউ-কাঁহা ডেকে ভরায় গগন,
আর্দ্র পুলকে কেঁদে উড়ে চলে সোনার বলাকা,
ঘিরে ঘিরে মেঘ ঘনগর্জনে নভ দেয় ঢাকা !

বরিষার মধু-গুঞ্জন মনে দেয় মোহ ভরি,
প্রেমাতুর শত কীট-পাখি গায় সুখের কাজরি !
তরু-শাখা ছেঁকে মেঘের কোমল অমারাশি ঝরে,
ধরার অলস লালসা গোপনে বোনে অন্তরে !

কী যেন বলতে চায় রিমিঝিমি বৃষ্টির জল,
জাগায় শিহর, ছুঁয়ে যায় ওবা ভিতব মহল !
ধারায় ধারায় ঝরে যায়, করে ধরণী বিবশ,
মাটির কণায় তৃণে-তৃণে ভবে অসহ বভস !
সে বাবিধারাব আলিসা আঁকড়ে ঝোলে মোব মন,
এসো মোরে ঘিবে গাও সমবেত শ্রাবণ-সঘন।
এসো ঝুলি মোবা সবাই ও বামধনুব ঝুলনে,
যেন বা˝ বাব আসে এ মোহন শ্রাবণ জীবনে !

মর্ম্ম-কথা

বেঁধে দিলে কেন হৃদয়ের সাথে
হৃদয়-ডোর !
চির অজানিত হৃদয়ের সাথে
হৃদয় মোর !

আর না গোপন রইতে পারে এ
মর্ম্ম-কথা,
আর না নিরোধ রইতে পারে এ
ধু-ধু-উতরোল হৃদয় ব্যথা ;
বিবশ, বিকচ হয়ে ওঠে গান
হৃদয় ভোর !

অশরীরী এই প্রাণের বাঁধন
মর্ম্ম-জ্বালায় দহে তনুমন !
মুগ্ধ হৃদয়, রূপবিভারে সে
দগ্ধ কামনা করে অর্পণ !
কিছু নেই যার নেওয়ার চাওয়ার
হৃদয়ে ওর !
বেঁধে দিলে কেন হৃদয়ের সাথে
হৃদয়-ডোর !

ভারতগীত

জয় জনভাবতেব জয় জনমানসেব
জনগণ তন্ত্র বিধান।
ললাট উদ্ভাসিত হিমালয় উজ্জ্বল
দ্রবিত কণ্ঠহার ঐ ভাগীরথীজল,
বিন্ধ্যপ্রদেশ কটি সিন্ধু চরণ তলে,
গায় শাশ্বত গুণগান।

সবুজ সবুজ খেত বহে নদ নির্ঝব
জীবনেব শোভা ঐ প্রভাসিত উর্বর,
বিশ্বকর্ম কোটি বাহুতে স্বনির্ভর
ধ্রুবপথে অগণন চরণ উন্মুখর।

প্রথম সভ্যতাব জ্ঞানের উৎস তুমি, তোমারই তো সামগান,
নব মানবতা জানি সে-ও তব নির্মাণ,
সত্য অহিংসাব পন্থা তোমারই দান,
জয় জয় জয় হে শান্তির আধার অনির্বাণ।

প্রয়াণতূর্য বাজো বাজো মন্দ্রস্বনে,
পটহ তুমিও বাজো সুতীব্র গর্জনে
সত্যসেনানী, জাগো লৌহভুজের পণে।

শক্তিস্বরূপিণী, বহুবলধারিণী, ভারতমাতার এই গান,
ঐ ত্যাখো শিহরায় ধর্মচক্র-আঁকা অবিজিত ত্রিরঙা নিশান

জয় জয় জয় হে অভয়, অজেয় এক পরিত্রাতার সম্মান।

স্বপ্ন-বন্ধন

বেঁধে নিলে তুমি হৃদয় আমার কুসুমের বন্ধনে,
মধুর জীবিত বিভাসম অনুলিপ্ত হলে যে মনে !
বেঁধে নিলে তুমি আমায় তোমার স্বপ্ন-আলিঙ্গনে !
শত শত তনুশোভা যেন ঐ ফিরিছে আঁখির আগে,
কল্পনা যায় রাঙিয়ে তোমায় শত ভাবে শত রাগে,
হে মানসী, তুমি শতবার যেন স্ফুরিত একটি ক্ষণে !

তোমার স্মরণে যদি পেত প্রাণ স্বপ্ন, এঁকে ও ছবি,
অবাক মানিনে, প্রাণ হতো গান, প্রেমী হতো যদি কবি !
তোমায় দেখে ও হিমচাঁদিনীও ঢেলে দিত যদি রবি !
সুরভির মতো সহজ মধুর নেমে এলে মোর পানে,
শীতের বেলায় বসন্ত, রস নিয়েলে বিরস প্রাণে ;
প্রেম ভরে দিলে হৃদয়ে, হৃদয়স্পন্দন গানে গানে !

তুমি কি শরীরী ? দীপশিখা-সম কৃশা ও কনকামালা,
মূক মাধুরিতে ভরা, যেন লাজ সাকারা লাজুকবালা,
তুমি কি রমণী ? স্বপ্ন সাধের রূপে রূপে তনু আলা ?
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে জেগে উঠেছে সুষমা তোমায় দেখার ছলে,
চলচপলতা তণিমার মতো পশেছে দেহের তলে ;
কোমলতা যেন বিছানো রয়েছে কম দেহে অবিরলে !

যেন ফোটা ফুল, দেখা দিলে তুমি ধরণীর অঙ্গনে,
রূপের পসরা ছেয়ে গেল ধরা ফুটে উঠে শত রঙে,

ছায়া-হেন গেল চাঁদিনী গুটিয়ে, উষা লাজ-আবরণে !
তোমার মাঝে যে লাবণ্য-মধু, অসীম সম্মোহন,
তোমারে এ প্রাণ নিঃশেষে দিতে পাগল হয়েছে মন ;
তুমি কি জানো না শক্তি তোমার, অপার আকর্ষণ ?

বেঁধে নিলে তুমি হৃদয় প্রণয়-স্বপ্নের বন্ধনে,
তুমি জানো ভালো লেগেছে কী হেতু, কী আছে তোমার মনে !
হাসো তুমি রামধনুর মতন অশ্রু-মেঘের কোণে !

রাঙিয়ে দাও

রাঙিয়ে দাও, ওগো রাঙিয়ে দাও এই আকুল মন!
অমর রূপকার কিরণ-তুলি দিয়ে
রাঙিয়ে দাও ঐ উড়াল মেঘাসন !

চাঁদের রঙ এনে রাঙাও মন-ঘোর,
রাঙাও বিজলিতে বাসনা-ডানা মোর,
বরিষা ঢালো এই হৃদয়-অম্বরে
শোভার সুনীবব সম্মোহন !

আশার হোক বর রামধনুটি সেথা,
রামধনুর বুকে স্বপ্ন-শব বেঁধা,
বিরহ-অশ্রুর আবেশ হোক মেঘ,
রহস-রঙ যত হোক গোপন !

নব শোভার রঙে রাঙাও আঁখি-যুগ
প্রণয়-মাধুরিতে হৈম করো বুক
রাঙাও গানে গানে এই মদিরাধর
স্বর্গ-শোণিমায় রাঙাও কর-চরণ !

উপুড় করে ঢেলে কিরণ ঘটটিরে
রাঙাও সাত রঙে প্রাণের পট ঘিরে,
উথাল পাপড়ির রঙিন বুক থেকে
পড়ুক ফুটে অন্তরের যৌবন !

রঙিন হয়ে ওঠে যদি এ অন্তর,
গোচর হয়ে ওঠো তুমি, হে অগোচর,
নব্য চেতনার পাবক-কণা আমি
ধরণী ভরে করি অবাধ বিতরণ

গীত-বিহগ

আমি নব মানবতার বারতা শুনিয়ে যাই,
স্বাধীনলোকের গৌরব-গাথা গেয়ে বেড়াই,
মন-ক্ষিতিজের পারে আমি দূর শাশ্বতের
দীপ্রভূমিব জ্যোতিবাহী হয়ে ফিরেছি তাই!
সোনার ঝরণ ঝরিয়ে যুগের ধ্বংসশেষে,
নব প্রভাতেব নভ-তলে উঠি অবাধ হেসে,
জীবনের শীতপ্রহরে মানব-মন-শাখায়
নব বাসন্তী অনলপত্রালিকা জ্বালাই!

আবেশোদ্বেল জনজলধিব অকূল জলে
নব স্বপ্নের উচল জোয়ার দি উচ্ছ্বাসি,
শীত কেটে গেলে বন কাঁদে যবে ধরণীতলে
যুগ-পিক হয়ে প্রাণের পাবক বরষি আসি!
মাটি-ম্লান ভব-ক্লান্ত জনের পা-দুখানিরে
স্বপনচরণে চলার উপায় শেখাই ধীরে,
দুঃখ-তাপের ছায়ায় গ্রস্ত মনের আগে
ধরার মুক্ত বুকের সুষমা দি পরকাশি!

জীবন-মনের মাঝে সুষুপ্ত মতিরে আমি
অনিমেষ আত্মিকতা-সুখে জাগিয়ে রাখি,
তমসা-প্রজু বাহিরমুখী যে ছড়ানো মন
হৃৎ-সিঁড়ি ধরে আমি তা উপরে উঠাতে থাকি!

আদর্শ-মরীচিকায় দগ্ধ মৃগগুলিরে
মন্দাকিনীর অন্তর্পথ বলে দি ফিরে,
জনে জনে নব মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলে
মুক্তকণ্ঠে জীবনের রণশঙ্খে ডাকি !

আমি সেই গীতবিহগ, মর্ত্যনীড়ের থেকে
চেতনাগগনে মেলে দি মনের ডানা আমার,
মনোগহনের দীপ্ত প্রকাশ উৎসারিয়া
স্বর্ণগাহনে সিঁচি এ প্রাণের অন্ধকার !
স্বর্গদূতেবে বেঁধে নি আমার ভাবনা-ডোরে,
নিত্য নি টেনে জনজীবনের অঙ্গ করে,
মানবপ্রেমিক, রচি পৃথিবীতে নব হ্যুলোক,
মানুষের এই ধরায় বিলাই দেবোপহার !

স্বর্গ-বিভা

কেমন ও স্বর্গ-বিভা দিলে
ভূ-মানসে ঢেলে, হে মোহন,
হেরি, যেন মাটির তমসা
অগ্নিসম জ্বলে অনুক্ষণ !

নব স্বপ্ন ওঠে লেলিহান—
বিকিরিত সে শোভার মায়া,
গহন অবচেতনা ঘেরে
কাঁপে শতরঙ্গী উপচ্ছায়া !

যবে ঊষা জ্বলে ওঠে নভে
অস্তে ডোবে চন্দ্রমামণ্ডল
চেতনা-দিগন্তে আভা-স্মিত
ধরা হয়ে ওঠে স্বর্ণোজ্জ্বল !

ফুলে ফুলে রঙের আগুন,
গুঞ্জে অলি, গায় পিকদলে,
সবুজাভ হর্ষে ভরে ধরা—
রশ্মি জ্বলে ঢেউয়ের আঁচলে !

ভৌতিক বস্তুর ঘনতায়
হয়ে ওঠে চেতনা দুর্বহ,

ভূ-জীবনে আলোর-এ জোয়ার
যুগ-মন-নদীরও দুঃসহ!

চেতনা-পুঞ্জিত ঐ ধরা
যুগ-যুগান্তের মনাবৃত,
তপ্ত স্বর্ণনিভ দীপ্ত হয়ে
ফের মানবিক, স্বরার্পিত!

যুগাবদান

তোমার নিত্য নতুন ও রূপ শোভা
জীবন-বাহুতে পারি আমি বেঁধে নিতে,
জন-মন ভরে দিতে পারি মনোলোভা
দেবতা-রম্য তোমার অমব গীতে !

সুখ তব ভরে দিতে পাবে ধারাপাতে
ভব-বেদনায় ক্লান্ত হৃদয়খানি,
লোকাতীত তব দেবত্ব—নেই তাবও
জগৎ-প্রাণের তিলেক অঙ্গহানি !

করুণা তোমার মানুষের পৃথিবীব
কঠোর হৃদয় করে দিক উর্বর,
যুক্ত কর্ম—ধরণী ও জীবনের
অর্পিত হোক তোমাতে অনন্তর।

দেখ মানবতা করে ঐ বিকিরণ
হৃদয়মোচন দিব্যতা পলে পলে,
ধরার মনের গোপন স্বর্গ-কাম
ভেসে চলে যেন ধরার উপরতলে !

অন্ধকারের এ ঘোর প্রহরকালে
দ্রব হয়ে যায় মানসচেতনা যত,

জড় জাগতিক শাপিত শক্তিগুলি
মানবশরীরে হয় ফের জাগ্রত।

তরুশিরে-শিরে ফুলের মুকুট শোভে
সুরভি সমীর বুকে আনে মদ বহি,
ফুটে ওঠো মন হতে এ জীবন হতে
নব শ্রী শোভার সুচেতনা তুমি অয়ি!

বৈদেহী

স্বপ্নের শরীরী ওই চূড়ার তলায়
লুকালাম আতুর বয়ান,
ও যেন শোভার উরঃস্থল মনোহর
হৃদয়স্পন্দন যার গান !

গৌর-হেম চেতনা স্বয়ম্ জমে ওঠে
কোমল উরগ-কলি ভরে,
সে তাবে উল্লাসে তার অমর নিঃশ্বাসে
আভার দোলায় রাখে ধরে

তারই মাঝে ফুটে ওঠে অন্তঃসুষমার
রত্ন-প্রভ হীরক পল্লব,
নবীন উষার এক স্বর্গীয় পাবক
বাসনায় জ্বলে অভিনব !

এ নয় আবদ্ধ রুদ্ধ লালসা, যা রয়
নারীপ্রতিমায় পরিজাত,
এ সেই দেবতাদের হৃদয়সম্ভব
শ্রদ্ধা প্রতীতিতে পুণ্যস্নাত !

নিত্য এরে নিয়ে কলামন্দিরে মানব
অন্তর্মনে করে সংস্থাপন.

সত্য শিব সুন্দরেবে নিত্য অবচয়ি
প্রিয়পদে করে সমর্পণ।

সহস্র ইঙ্গিত হয় নৃত্য উন্মুখর
চিত্র করে আঁখি নিষ্পলকে,
জীবনের দুঃখসুখ হেরি তা সতত
বেজে ওঠে সুরের সপ্তকে!

ফুলের দেশ

(নব বসন্তসূচক বাদ্য-সঙ্গীত)

পুরুষের কণ্ঠস্বর

এ দেশ ফুলের দেশ, জ্যোতির্ময় মনের রূপক,
এখানে ঘোরেন নিত্য অন্তর্দ্রষ্টা কবি কলাকার
সঙ্গোপন কল্পনার পথে পথে, ভাবোন্মেষানত!
হেথা প্রেরণার স্মিত অপ্সরারা ঊর্ধ্বলোক হতে উড়ে এসে
শতরঙা কুসুমপাপড়ির দ্যুতিবর্ষণ ঝরিয়ে দিয়ে যায়,
স্বপ্ন গুঞ্জরিয়া ওঠে : দেখ ওই স্বর্ণিম ভৃঙ্গের
গলার রজতঘণ্টি বেজে ওঠে পুলকাতিরেকে—
প্রবাহিত করে দেয় দেবগীতি মাটির উপরে!

স্ত্রী-কণ্ঠ

এই ভূমি গন্ধর্বজাতির মুগ্ধ অভিসারভূমি,
বস্তুজগতের কোলাহল থেকে ঢের দূরে হেথা
স্বর্ণিম বিভায় সংরচিত হয় সৃজন-কল্পনা
ভাবী বিশ্বমানবের সূক্ষ্ম আকল্পিত বর্ণালিতে!
হেথা অহর্নিশি ওঠে গানের গুঞ্জন, ভাবগাঢ়
হৃদয়োপদেশ হতে নিরন্তর ধারাপ্রবাহিত!

(বাদ্য সঙ্গীত : সমবেত গান)

এ দেশ ফুলের দেশ!
হেথায় কেবল জীবনসুষমা
সাজে নিত নববেশ!

হেথায় লুটায় শত রামধনু,
অপলকে হাসে স্বপ্ন অতনু,
হেথা দোলা খায় কিরণ ঝুলা-য়
মানসের উন্মেষ!
স্বর্ণঝরণা কলনাদে ঝরে,
হিয়া ভরে ওঠে কোয়েলার স্বরে,
পুলকের বাণী সুষমারে দেয়
স্বর্গীয় প্রেমাবেশ!
হেথা গুঞ্জিত নিতি দিশিপল
ধারাসারে জীবনের মঙ্গল,
সৃজনচেতনা রচে যায় হেথা
স্বপ্নলীলা অশেষ!

(তানপুরার স্বর)

পুরুষ কণ্ঠ

এ বিজন বনছায়ে একদিন রহিত একাকী
এক স্বপ্নদ্রষ্টা কবি, নবারুণ-সম রূপবান,
লতাপত্রালিতে ছাওয়া কুসুমিত পাতার কুটিরে!
জীবন-সংঘর্ষ যত, করুণ ক্রন্দন, কলরোল
তার ভাব-জগতের স্পর্শ পেয়ে সে দণ্ডেই পেতো পরিণাম
মর্ম-গীতে, যেচে নিয়ে জীবনের নতুন অভূত মূল্যমান
যুগ-জীবনের স্বপ্ন-শোভার বেষ্টনে হতো বৃত !
ভাবোদ্বেল বক্ষে বনকুটিরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে
সুবাসগুঞ্জিত মধুপের মতো ছিল সে স্বগত—

(স্বপ্ন-বাহী বাদ্য-সঙ্গীত)

কবি

এ দেশ ছায়ার দেশ, কল্পনার ক্রীড়ানিকেতন,
হেথা বস্তুজগৎ নিজের সব জড়ত্ব ঘুচিয়ে আনন্দেশী
ধরে নেয় সূক্ষ্মরূপ ভাববিদ্রাবিত!

জীবনের সংঘর্ষের প্রতিধ্বনি উচ্ছ্বসিত হয়ে
যেন বদলে দিয়ে যায় বিকল হৃদয় গানে গানে!
হেথা ভয়ঙ্কর এসে সৌন্দর্যেরে বেঁধে প্রীতিপাশে
ক্ষণমুহূর্তের তরে নির্মম বিধিরে উপহাসে!

(গম্ভীর প্রসন্ন বাদ্য-সঙ্গীত)

কবি

শান্ত, সৌম্য, ঘুমন্ত বনশ্রী ওই জেগেছে আবার
নব প্রভাতের স্পর্শে স্বর্ণিম চেতনা বুকে ধরে,
স্বজন সামের মতো নীড় হতে নির্গত নিঃস্বন,
পুলকে বিভোর ওই থরোথরো শিহরে পত্রালি!
সুরভি পবনে মন্দ মন্দ নেয় ধরণী নিঃশ্বাস,
আলস তাড়িয়ে জেগে ওঠে ক্রমে বন-ছায়াগুলি!
এ প্রভাত সংস্কৃতিরও প্রভাত—আশ্চর্য সুমহান,
মূক প্রার্থনার মতো, পূত আশীর্বাদের সমান!—
বিশ্বের মানুষেরে যে বিস্ময়ে করেছে নিষ্পলক
দিব্য স্বপ্ন-সম—চির-দৈববাণী-সম নেমে এসে।

(হর্ষ-সূচক বাদ্য-সঙ্গীত)

আজি যুগ-নিশান্তিকা: আজ পৃথিবীর চেতনাতে
চলেছে সমাপ্ত হয়ে সংস্কৃতির প্রতন বলয়!
আজ নবযুগের প্রাণের আশা-অভিলাষ যত
মর্মমধুরিমা-ভরা গীতলহরিতে ভরে যায়—
গুঞ্জরণ তোলে—তারা ছায়ার মতন নবমুকুলগুলির চারিপাশে
সন্নিহিত হয়ে আসে। সদ্যঃস্ফুট কুসুমে কুসুমে
বিহসিত হয়ে রয় স্বর্ণনীহারের মুক্তা-কণা,
সমগ্র ভূতল কাঁপে আতুর স্বপ্নের পদ-চাপে!
আমি দেখি মনশ্চক্ষু দিয়ে সেই তালে তালে শব্দ করে বেজে
দিগন্তে এগিয়ে চলে শত শত নির্ভয় চরণ!

(বাদ্য-সঙ্গীত : দূর থেকে নরনারীর সমবেত গান ভেসে আসছে)

যুগ প্রভাত,
রক্তস্নাত যুগ প্রভাত !
মুছে গেছে সব অন্ধকার,
টুটে গেছে সব মনের ভার,
মুক্ত পন্থ, মুক্ত দ্বার,—
ঘুচেছে রাত !

সাগরে সাগরে বেঁধে সেতু,
আকাশে উড়িয়ে জয়কেতু,
গণমানবের জয় হেতু
চলো ভাই, চলো পূজ্যপাদ !

পড়ুক ভেঙে ও গিরিশিখর,
মরুভূমি হোক নবোর্বর,
বিঘ্ন বাধায় রহো অভর,
করো আঘাত, করো আঘাত !
করো আঘাত !

(নরনারীদের প্রবেশ)

স্ত্রী-কণ্ঠ

কে তুমি, কে ? অরুণ, বসন্ত, মদনের মতো রূপ
পাতার কুটিরে হেথা করে আছো আত্মসঙ্গোপন
পাখির মতন একা ? নগর-নগরী, জনপদ
থেকে বহু দূরে, সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হতে পরাঙ্মুখ হয়ে,
যুগজীবনের সংঘর্ষের থেকে, জন-আকর্ষণ থেকে দূরে ?

কবি

অরুণ ? বসন্ত ? আমি মদনের মতো ? একা বিহগের মতো ?
আমি কলাকার, কিন্তু জীবনের সংঘর্ষ এড়িয়ে

আমি পলাতক নই !—দেখ মোর স্বপ্ন-নিমীলিত
দু-চোখে বিম্বিত হয়ে পড়েছে সুদূর ভাবীকাল !

পুরুষ কণ্ঠ (সাশ্চর্য)

বিম্বিত হয়েছে ভাবী ?

কবি

স্বর্গের বেণীর থেকে আমি
রামধনু ছিনিয়ে এনে ধরার তিমির কেশপাশে
গেঁথে দিয়ে যাবো, আমি ফোটাবো জীবনপঙ্ক ভবে
দেব-বিভূতির সাধ্যে মানবিকতার কোকনদ !
দেখ গড়ে তুলি এই অন্তর্হৃদয়ের পরিযোগে
নব মানবতার প্রতিমা !

জনগণ

হা-হা-হা-হা ! !

কবি

আমি ওই বিরাট জীবন তারই প্রতিনিধি ! বন মর্মরের,
যুগজনরবের সবটুকুই আমার সুচির-পরিচিত ।
ভোম্‌রার মধুর গুঞ্জরণধ্বনি, কোয়েলা-কূজন
জেনো সে আমারই কণ্ঠস্বর ! ওই স্বর্ণাতপ আমারই উদ্ভাস !
সোনালি স্বপ্নের সেতুবন্ধে বেঁধে ধরা ও স্বর্গেরে,
রচে দিয়ে যাবো আমি সুর-নর-মোহন সোপান !

প্রথম স্বর

মিলেছে দেখছি খুব অহঙ্কার-ঐশ্বর্য তোমার !

দ্বিতীয় স্বর

খেয়েছো দেখছি আত্মবঞ্চনার উন্মদ মাদক !

প্রথম স্বর

তুমি কলাকার, তাই গড়ো বুঝি হাওয়ায় মহল !
তাই বুঝি নিবাস পেতেছো ওই আত্মপলায়নের দ্যুলোকে !

কবি

অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত সেনানি নিয়ে বিজয় পতাকা
উঁচু করে ওই যে কাতার দিয়ে চলেছ, তুমিও
সাধিছ আমারই কাজ অগোচরে,—ধরার ধূলিতে
যে-জীবনতৃষ্ণা শত ফণা মেলে ভুজঙ্গের মতো
তলায় লুটায়, আমি উর্ধ্ব থেকে তটস্থ-সদৃশ
শোভারেখাগুলি তার চিত্রায়িত করে নি কেবল,
স্বপ্রসর যুগের চৌপটে তাকে বাঁধিয়ে নি : প্রাণঘাতী তার
বিষের ছোবল পান করে নি অক্লেশে, মর্মাহত
হয়ে প্রতি পলে জ্বলি হৃদয়দহনে ! তিক্ত ঘৃণা—
মধুর প্রীতিতে, কটু তমিস্রা—হৃদয়-দীপায়নে
আত্মবিদ্রাবিত করে, শেষে তার পরে
সিঁচি নিজ চেতনার অমৃত আমার ! শুধু শব্দ ও স্বরের
রিক্ত সাধনাই মাত্র নয় যুগকবির সাধনা,
অপার পাঁকের মধ্যে ফোটাবে সে মানসকমল,
সুষমা সন্ধান করে জীবনের বিশৃঙ্খলতায়
সাম্য, সঙ্গতি ও সার্থকতায় তা ভরে দেবে !

প্রথম স্বর

যথেষ্ট হয়েছে !
বাক্ চপলতা থাক । বোধ করি শোভন সীমানা
পেরিয়ে গিয়েছে তা-ও ! ওহে মৃগতৃষ্ণার পূজারী,
তুমি কি বলতে চাও তুমি জীবনের প্রতিনিধি ?
বসেছো বিধাতা হয়ে এখন মানব-নিয়তির !

দ্বিতীয় স্বর

আমরা ভাবীকালের রচয়িতা, যথার্থত মানবিকতার
আমরাই জীবনশিল্পী, বিশ্বের জনতা, যুগযুগ ধরে মোরা
লোহার শিকল ছিঁড়ে, বজ্র-সম আজ সংগঠিত,
বন্ধন-বিমুক্ত, নব জনমানবতার রক্ষক !

সামূহিক জীবন-চর্যার আবশ্যকীয় দাবিতে সমতল
মানবসমাজ গড়ে তোলার কারণে বাধ্য আজ!
যদি তাতে যুগজীবনের নব-স্পর্শ পেয়ে তোমার মতন
আদিম মানুষ পারে বিকাশিত হতে, পারে বিশোধিত হতে!

কবি

অবশ্য, আদিম আমি!

কয়েকজন একযোগে (সদর্পে)

আর চিরনবীন আমরা!

স্ত্রী-কণ্ঠ

না, না,—কেন পরিহাস করো তুমি আমাদের সাথে!
তুমি কবি, তুমি কলাকার, যুগ যুগ ধরে তুমি
শাপিত শোষিত জনগণের পাশেই রবে স্থির!
যুগ-সঙ্কটের কালে ভরা কণ্ঠে গেয়ে উদ্বোধন
তুমি জনতাকে দেবে সাহস, সম্বল!

কবি

অবশ্য, সুযোগ যদি দেন জনগণের নায়ক!

স্ত্রী-কণ্ঠ

দেখ, তুমি দেখ এই কঙ্কাল-কাঠাম অস্থি-সার—

একজন

বজ্র হয়ে উঠেছে এ দধীচির অক্ষয় পাঁজর!

স্ত্রী-কণ্ঠ

দেখ, দেখ নগ্ন ক্ষুধাতুর মনুষ্যত্বের ছলনা…
দেখ ওই জীবনের নীরক্ত নিষ্ঠুর বিষণ্ণতা!
দেখ বর্তমান পিঁষে ফেলছে এদের ভয়ঙ্কর
নির্মম পীড়নে! যদি একবার চক্ষু খুলে তুমি
তাকাও ওদের দিকে দেখ সত্যকার চেহারাটি,

করুণায় গলে যাবে হৃদয় তোমার, তুমি মর্মাহত হয়ে
চমকে উঠবে, ওগো ফুলের দেশের অধিরাজ!

একজন

আরো হয়তো বা তুমি ঘৃণায় ফিরিয়ে নেবে আঁখি,
হয়তো উন্মত্ত হয়ে যাবে ক্রোধে, যত আদর্শের
প্রতিমা-পূজারীদের এমন কুৎসিত কার্য দেখে।
কখনো পারেনি হতে মৃত প্রতিমার পূজকেরা
জীবিত জনতা—যারা জীবন্মৃত—তাদের পূজারী!

কবি

দেখছি, লজ্জায় মিশে চলেছি মাটিতে—সব দেখে।
কবে থেকে যেন মনশ্চক্ষুর সুমুখে নৃত্যপর
হয়ে আছে সংক্রান্তিকালের সেই ছায়াগুলি! যেন কবে থেকে
চলেছে চীৎকার করে খাড়া সেই ভূখা কঙ্কালেরা,
অবচেতনার প্রেত ভরে আছে তীক্ষ্ণ অট্টহাসে!

(তুমুল বাদ্য-সঙ্গীত : সমবেত গান)

আমরা অতীতজীবী কঙ্কাল,
আমরা ক্রুদ্ধ রুদ্ধ করাল!
কণ্ঠে লগ্ন ত্রিশূল ফলার
সন্ত্রাসময় সংহারী কাল।
আমরা মনুষ্যত্বের প্রেত
হয়েছি সকলে আজ সমবেত,
আমরাই বীজ, আমরা সে ক্ষেত,
অনিঃশেষিত শক্তি বিশাল!
আমরা খড়্গ, আমরাই ঢাল,
আমরা জোয়ার-সম উত্তাল,
রুদ্রের দৃগ্‌-বহ্নি ভয়াল,
ধরণীর জয়মাল্য উড়াল!

কয়েকজন একযোগে

মিথ্যা, সব মিথ্যা আজ বিশ্বসংসারের চতুর্দিকে,
একমাত্র সত্য ওই মানবচিত্তের ঘোর ঘৃণা।
মিথ্যা নৈতিকতা, মিথ্যা সকল আদর্শ, যা কেবল
জন-পীড়নের জন-শোষণের কারণে উদ্যত!
একমাত্র সত্য ওই বিষমতাগুলি, ওই প্রতিহিংসা-স্পৃহা,
সত্য শুধুমাত্র ওই অতৃপ্ত পিপাসা, ওই তৃষা।
মানুষের মনে আজ বিদ্বেষের গরল উথাল,
মানুষের মনে আজ জ্বলন্ত ক্রোধাগ্নি লেলিহান,
ভয়ঙ্কর অনলপর্বত আজ বিস্ফোরণ-লগ্নে উপনীত,
এখনই জ্বলন্ত শিখা হু হু করে বুঝি উদ্গীরিত
হবে, বুঝি নিঃশেষে পুড়িয়ে দেবে ছল মিথ্যা কপট জগৎ,
মানুষের হৃদয়ের নির্মমতা, নৃশংসতা সব,—
ভস্মসাৎ করে দেবে জগতের দুঃস্বপ্নসমূহ!

(বিবর্তন-সঙ্গীত)

কয়েকজন একযোগে

এরা সব ছায়া, সব আদর্শের ভয়ঙ্কর ছায়া,
আমরা সমস্ত ছায়া পায়ে দলে যাবো, তার আভাসগুলিরে
পায়ের তলায় পিঁষে চলে যাবো, জন মন থেকে
বহু শতাব্দীর মৃত সংস্কারগুলিরে কুঁদে তুলে নেব, লুপ্ত করে দেব।

(উত্তেজনা-দ্যোতক সঙ্গীত)

কবি

এরই জন্য তোমরা কি সম্মানিত জীবনের শ্রম
পরিত্যাগ করে ফের বর্বর-জীবনে গেছ ফিরে।—
দেখছি, বহু যুগের সংগঠিত মন যেন ওই
সামূহিক জনবর্বরতায় ছড়িয়ে গেছে আজ।
আদর্শের স্বর্গ-চুম্বী চূড়াগুলি পরিবর্তনের
ঝঞ্ঝায় বিচূর্ণ হয়ে যেন আজ মাটিতে লুটানো,

আর বিনাশের গাঢ় অন্ধকার ঠিক অতখানি
অতল গহ্বরে পড়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ধরিত্রীর
অন্তর ক্ষতবিক্ষত করে যায়!

জীবনের সেই
মোহময়, পাবন, নিভৃত উপত্যকাগুলি, একদা ছিল যা
চির-করুণার চির-মমতার স্বর্ণিম প্রকাশে পরিপ্লুত,
সভ্যতার ক্রন্দনকল্লোল এসে পশেনি যেথায় কোনোদিন,-
আজ সেই উপত্যকা অবিশ্বাস—প্রতিহিংসাঘোর
দৈত্যদের নির্মম পায়ের চাপে পিষ্ট বিমর্দিত হয়ে আছে!
তার অভ্যন্তরে আজ ঢুকেছে মানুষী নির্দয়তা
তোপেব মুখে সে ওই কথা বলে বিকট নিনাদে!

(বিপ্লব-সূচক বাদ্য-সঙ্গীত)

আজ একাকার হয়ে যায় ওই পাপ পুণ্য সব,—
মানুষের অন্তরবিসারী গাঢ অন্ধকাব হতে
ঘৃণা, দ্বেষ, অন্যায়, কপট, ছল, স্পর্ধা, হিংসা সব
সমুচ্চ চীৎকারে হেঁকে যায়—শুধু বাহ্য সংগঠন
একমাত্র সত্য! বাহ্য সংগঠনই চবম অন্বিষ্ট আমাদের!
শুধু বাহ্য প্রযত্নই একা সব কিছু এ জগতে,
অন্তর্লোক, সে কেবল একা হৃদয়ের,—শুধু ভ্রম!
অন্তর্মুখী সংগঠন শুধু পলায়ন, ভ্রান্তিমান!
সংস্কৃতি? সে শুধু দাসী—শ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত!
আপন মুঠিতে ধরে অণুসংহারের শক্তি, যুগ
ভীষণ সশব্দে বিজ্ঞাপিত করে বিনাশের বাণী!

কয়েকজন একযোগে

ভীরু, তুমি ভীরু! তুমি তারই জন্য বুঝেছি বিলাও
নাগা ভূখা মানুষেরে অধ্যাত্মবাদের উপদেশ!
কলাকার নও তুমি, তোমার ও দুর্বল হৃদয়ে
নেই যুগপ্রতিভার বজ্রঘোষী বিদ্রোহ কোথাও!

তোমার শোণিতে জ্বালা ফোটে না ঘৃণায়, কিংবা ক্রোধে
শোষিত পীড়িত মানবতার বিবাস বেদনাতে!
কেউ তো তোমায় দয়াদ্রবিতও দেখেনি কখনো!
জগৎ জীবন থেকে পলাতক, নিরত ফুলের উপবনে,
তোমার নিবাস পাতা আত্মসন্তোষের স্বপ্নলোকে!
জানি যুগসঙ্কটে দেবে না তুমি সঙ্গ জনতাকে,
রিক্ত শিল্পকলা, রিক্ত সৌন্দর্যের ভণ্ড আরাধক!
ধিক! আত্ম-অহঙ্কার ও তোমার, জেনো জনপথের কণ্টক!

কবি

কিন্তু হায়, তোমাদেব সজ্ঝীয় অহম্—সে যে দুর্গম পর্বত!
আছে জনগণেরও তো ভিতরপৃথিবী, সেই ভিতরে রয়েছে জনমন,
ভিতরেই আছে সূক্ষ্ম পরিস্থিতিগুলি জীবনের,
ভিতরেই মানুষের মানবতা, সাঁচ্চা বিশ্বলোক,
সে ভিতরবিশ্ব নয় জাতি-বর্ণ-শ্রেণী-বিভাজিত,—
আজ তারে নব্য-সংগঠিত, পূর্ণ সক্রিয়, চেতন
করে বহির্জগতে স্থাপিত করে যাবার দায়িত্ব মানুষের!

কয়েকজন একযোগে

চলো বিশ্বজন, হও অগ্রসর অসিধার-পথে,
সাগর মন্থনে চলো, পর্বতের শিখর নোয়াতে,—
দেবতার শিরোপরি করো জয়ধ্বজা সংস্থাপন!
পরীর পায়ের চাপে গুঞ্জিত এ বনফল-দোলা
উপত্যকা আমরা মাড়িয়ে যাবো, কীর্ণ করে দেব স্বপ্নে-ভরা
কুসুমপাপড়িগুলি চারিধারে ধরার ধূলায়!
বহির্জগতের লৌহমুষ্টি ফের অন্তর্জগতেরে
নবীন নির্মাণে গড়ে দিয়ে যাবে জীবন্ত আঘাতে!—
রবে না যখন বাঁশ, তখন কি বাজবে বাঁশরি?
আমরা এ যুগের বিদ্রোহী, আজ আমাদেরই ইচ্ছা দ্ব্যর্থহীন
সত্য ও ন্যায়ের উদ্‌ঘোষক!—আর বাকি সব ঝুটা!

(প্রয়াণ সঙ্গীত)

চলো ভাই, চলো পূজ্যপাদ !
ভাঙুক ও গৌরব-শিখর
জনভূমি হোক নাবোর্বর,
জড়তাবাধায় রহো অজর,
করো আঘাত, করো আঘাত,
করো আঘাত !

(প্রস্থান)

(তানপুরার আওয়াজ)

কবি

ধরিত্রীর নিশ্চল অবচেতন যেন ফের ফুলে ফুলে ওঠে
বর্বর যুগের আবেগোচ্ছ্বসিত তীব্র আলোড়নে,
বিশ্বজীবনের ক্রূর বিষমতাসমূহে আবার
ভরে দিতে সর্বজনবাঞ্ছা, নব-যুবত্বের মাংসল সমতা,—
মানুষের হৃদয়ের মোহ ও দম্ভের বজ্রশিলার উপরে
শত শত নিষ্ঠুর প্রাকৃত প্রতিহিংসার প্রহার হেনে সোজা !
বিস্ময়াভিভূত আমি ! আজ যবে চারিধার ভরে
ধরণীর উপেক্ষিত আবিশ্ব-বিস্তৃত সমতল
মানবজীবন স্ফুর্ত, পল্লবিত, লোক, সংগঠিত হয়ে উঠেছে প্রথম
ভৌতিক স্তরের পরে, যখন অখিল মুক্ত দৈন্য-দুঃখ হতে :
যখন গত যুগের নিষ্ঠুর বিধির লেখা সংখ্যাগরিষ্ঠের
ললাটলিখিত আর্ত পরাভব ক্রমে মুছে যায়,—
যুগের এমন লগ্নে যুগমানবের অন্তর্নভে
আজ জায়মান এক ঊর্ধ্বদিক-সঞ্চারী দিব্যতা,
নিজের অপূর্ব চিত্তশিখায় মনের—জীবনের
অতল গহনতার রত্নরাজি আলোকিত করে
সূক্ষ্ম প্রসারের দিগ্‌বিস্তারী অতুল শোভা আলোকিত করে

জ্যোতি-চমৎকৃত করে মানবমনেরে, জীবনেরে
দিব্য রূপান্তর করে, স্বর্ণিম উচল ঊর্ধ্ব হতে!
—কিন্তু বলো কে তুমি? নীরব জ্যোতি-বিদ্রাবিত জলদের সম
চিন্তায় বিনত, নিজ সঙ্গীদের ছেড়ে এসে কোন
অভিপ্রায়ে—এখানে এমন করে কীভাবে দাঁড়িয়ে আছো বলো?

বৈজ্ঞানিক

কী আশায় আছি? আমি বৈজ্ঞানিক! আমার কেবল
এই পরিচয়! ওই চপল বিদ্যুৎ, ওই বাষ্পরশ্মিদের
বেঁধে অবলীলাক্রমে বানিয়েছি যুগমানবের
ক্রীতদাসী! আমি ওই অণুর গরব চূর্ণ করে
ভূত-প্রকৃতির মূল শক্তিরে করেছি সমর্পণ
মানবচরণে! আজ মানুষ হয়েছে অধিপতি
সমুদ্রের-গগনের,—দেশের-কালের,—নিখিলের!
এই শতাব্দীতে আমি মনুষ্যসমাজে নিরন্তর
আরো ঢের চমৎকার দেখিয়েছি যন্ত্রের শক্তিতে,
পুরোনো যুগের তন্ত্র-মন্ত্র কিংবা ছলনার চেয়ে
যা আরো অনেক সত্য, অনেক বিস্ময়কারী,—যদি গুণে গুণে
জানাই, হবে তা আত্মপ্রশংসার পাতক নিশ্চয়!

কবি

হে সুহৃদ, তোমার অমর সেই দানের বিষয় আমি জানি,
তোমার উজ্জ্বল কীর্তিরাশি আজ ব্যাপ্ত দশদিকে,
ভূত-সংস্থিতির মাঝে বৈপ্লবিক বিবর্ত ঘটিয়ে
তুমি রূপান্তর এনে দিয়ে গেছ মানবজীবনে!
কিন্তু তবু শুধাই তোমায়, বলো আজ কি মানুষ প্রকৃতির
অধীপ?—না ক্রীতদাস? সে কি বিদ্যুতের
নিয়ন্তা শাসক?—না কি বিদ্যুৎ-বাষ্পই তাকে আজ
অধিকার করেছে নিঃশেষে?—হায়, মানবহৃদয়

অজা দর্পে দিশাহারা, বহির্জগতের অমাঘন
বীথিকায়-বীথিকায় শতভ্রান্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে!
জড়-পার্থিবতা তাকে করে গেছে হৃদয়রহিত!
প্রকৃতির মূল শক্তি তাকে সমর্পণ করে আজ
তাকে তুমি মহাবিনাশের পথে একা ছেড়ে গেছ!

বৈজ্ঞানিক

কখনো বদল হয়ে যায় জগতের কটু আর্থিক বিন্যাস,
যুগজীবনের বাহ্য বিষমতাগুলি হয় সমান সুষম :
স্বার্থ ও লোভের তীক্ষ্ণ নখর বিঁধিয়ে নরপশু
ভিজিয়ে তোলে না রক্তে মানুষের মুখ।—
ভয়ঙ্কর যান্ত্রিক যুগের সেই লোহার পঞ্জরে
শোনা যায় পুনরায় মানবিক হৃদয়স্পন্দন!
ক্রূর বাষ্প-বিদ্যুতের দানব মানব হয়ে উঠে
আবার শোষক থেকে সমাজসেবক হয়ে নামে!

কবি

শেষাবধি যদি আজ সংগঠিত হতো যুগমন
নিশ্চয় সার্থক হতো মানবচিত্তের বিবর্তন,
ব্যক্ত হতো না তাহলে পৃথিবীর আদিম সংস্কার,
যুগজীবনেব হৈম রূপান্তর হতো সংসাধন!
এই জড় পৃথিবী আবার অন্তর্জীবনের উর্ব্বগ বিভায়
প্লুত হয়ে হতো দেব-প্রশংসিত নব-সচেতন!

বৈজ্ঞানিক

যদি স্বপ্রকাশ হতো মানুষের রচনা-ক্ষমতা,
যদি সাধ্য হতো জীবনোপায়ের উচিত বণ্টন,
সামাজিক ভারসাম্য পেতো যদি পৃথিবীর শ্রম,
যন্ত্রের সমত্ব হতো আর্থিক সমত্বে বিভাজিত,—

শুধু তাহলেই স্বার্থ লোভ দ্বেষ স্পর্ধা বা অন্যায়
লুপ্ত হতো ধরা থেকে, বিশ্ব-ব্যাপী জনরক্তপাত
ক্ষান্ত হতো, মানবের যুক্ত-কর্মে স্বর্ণিম-চেতন
যুগসুপ্রভাত বিহসিত হতো নিস্তারি তমসা!

কবি

আরো, সাথে সাথে যদি ঊর্ধ্বচেতা হতো মানুষেরা
সর্বদিকে সমভাবে, চিত্ত সীমা অতিক্রম করে,
খণ্ডিত ভূ-জীবনের মিটে যেত সকল বিরোধ,
ভৌতিক-নৈতিক মান একই সাথে হতো নিয়োজিত
জীবনে তাদের! নিতো জনযুগ মানবিক ভারসাম্য তুলে,
যন্ত্রের জ্বলন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস শীতল হতো মানি!
বাহ্য রুদ্ধ আপন ক্ষুদ্রতা হতে নিঃসক্ত উপরে
উঠে অন্তঃস্থিত, অন্তর্দ্যুতিমান, অন্তঃচরিতার্থ হয়ে শেষে
হতো ঊর্ধ্বমুক্ত, অন্তঃসচেতন মানুষের মন!

বৈজ্ঞানিক

আমিও ওই কথাই ভাবছি এখন! আজ মিলেছে আমার
মহৎ প্রেরণা: আজ মেনেছি-যে মানুষ মূলত অন্তর্জীবী!
দেখছি স্পষ্টত, তার অন্তরেরই বিধানে মানব-পরিচয়ে
স্বনামসিদ্ধ সে: অন্তঃ-সংযোজিত, ঊর্ধ্ব-সমন্বিত!
আজকে মানুষ মরে গেছে! পরাজিত হয়ে ভিতর থেকে সে
বাইরে পালায় দ্রুত দৌড় দিয়ে, ব্যক্তিত্ববিহীন!
আত্মা-রিক্ত সামাজিকতার স্তূপ জমে আছে অঢেল নিষ্প্রাণ!
মানুষের মন আজ হত-ক্লান্ত, যান্ত্রিকতাভারে
ভেঙে-চুরে গেছে! পর্যবসিত সে গড্ডলশ্রেণীতে!
হয়েছে সে যন্ত্র-পরিচালিত ইচ্ছার যূথশ্রেণী,
হয়েছে সে ঘৃণা দ্বেষ স্পর্ধা ও তৃষ্ণার যূথশ্রেণী!
নারকীয় নীরক্তা ও নির্মমতার যূথশ্রেণী!
অবচেতনার অন্ধবাসনার আর্ত যূথশ্রেণী!

এই সামূহিক যূথ-মুহূর্তে এখন প্রয়োজন
মহৎ ব্যক্তির,—মুক্ত দেখ ওই দুরন্ত কামনা
পায়ে-দলে যেতে চায় মানুষের মিথ্যাভিমানেরে !
আজ মানুষের হাতে সমর্পিত নিখিল বিজ্ঞান
পৃথিবীপ্রলয়কারী আর লোকবিনাশী বনেছে !
কাপালিক হয়ে উঠেছে মানুষ, প্রাণ-বলি-প্রিয়
শব-সাধনায় রত, ধরা-শ্মশানের বামাচারী ! !

কবি

এখনো রণিত যেন লহরির রুপালি পায়েল
বাজে শিঞ্জিনীতে, যেন মাঠে-মাঠে অপার সবুজ হাসিমুখে
সোনা উগারিয়া তোলে, নবীনা মুগ্ধার
চপল চাহনি দিয়ে স্বর্গ উঁকি দেয়, যেন নবজাতকের
চারিপাশ ঘিরে চক্র দিয়ে ফেরে স্বর্গের পরীরা চুপিসাড়ে,—
কিন্তু চারিদিক ভরে অপরোক্ষ যুগ-সংঘর্ষের
প্রবল আরাবে, হিংস্র সভ্যতার প্রচণ্ড হুঙ্কারে
জীবনের সমস্ত মোহনীয়তা করে গেছে !—নিরিক্ত মানস,
বিবর্ণ জগৎ মরুস্থলী-সম নিরর্থ ও মৃত,—
জীবনের সাধ সব তুচ্ছ, রূপ মৃগ-তৃষ্ণা-সম গেছে উবে,
আশার দ্যোতনা সব প্রভারিক্ত, ভূতল শ্মশান !
(আশাপ্রদ বাদ্য-সঙ্গীত)
কিন্তু মনে রেখো তুমি অমৃতের সন্তান, বৃথাই এ নিরাশা !
আজ মাংসপেশী পর্বতাকার সপাটে খাড়া হয়ে
যদিও নিরস্ত করে যেতে চায় অন্তর্বাসী প্রকাশ-উদ্ভাস,
জানি জানি তবু একদিন চিত্তে উন্মীল হবে সে স্বর্ণনির্ঝরের মতো
এখন ফুলের দেশে পাতাঝুরি,—ঝরে যেতে দাও
হৃদয় হতে ও মূর্চ্ছা-অবসিত নিষ্প্রভ বৈভব,
সব কিশলয় হতে, কুঁড়ির গুণ্ঠন ঠেলে দিয়ে
উঁকি দিয়ে যাবে ফের নওল রুপালি আশা-সন্দীপ্ত জগৎ !

ফের মানুষের মাঝে বাহির-অন্তর হবে সুখে আ-যোজিত,
জীবন আবার হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় !
অন্যোন্য-আশ্রিত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর
হবে ধাবমান পূর্ণ-বিকাশের স্বর্ণ-দিগ্বলয়ে !

(হর্ষ-সূচক বাদ্য-সঙ্গীত)

বৈজ্ঞানিক

এ নয় স্বপন, জানি মূর্ত সত্য এই নিঃসংশয় !
মানুষ নিয়ত যাবে আপনাকে অতিক্রম করে,
অন্তর্মুখী আদর্শের নিত্য-নব ঊর্ধ্বগ প্রকাশ
জীবনের নব্য বাস্তবের সাথে বাঁধবে সে স্বচ্ছন্দ সহজে,—
সেই নব বাস্তবতা মানবিক হবে সুনিশ্চয় !

কবি

তোমার মুখে এ শুনে জীবন কৃতার্থ মানি আজ !
আমরা দুজনে এসো, বাহিব ও অন্তরের দুই প্রতিনিধি
চিরন্তনী চেতনারে আর এই ফুলের দেশেরে
পরিণত করি নব যুগের জীবনে, এসো সত্য করে তুলি !

(জনরব : রণবাদ্য)

দেখ শ্রান্ত ক্লান্ত মনে জনগণ ওই ফিরে আসে,
ধরা রক্ত-পূত করে, শোণিত-পঙ্কিল দেহ নিয়ে !
জ্যোতির্ময় শক্তিতে মিলিয়ে ওই জনশ্রম, এসো,
পৃথিবীরে করে তুলি শান্তিধাম
সুমঙ্গল গ্রাম একখানি !

(সমবেত সঙ্গীত)

মঙ্গলময় পূর্ণ কাম,
জন-হৃদয়ের লহো প্রণাম !
দ্বেষহীন হোক ধরার মন,

শোভায়িত হোক জন-জীবন,
সৃজন সাধে ভরুক নয়ন,
কর্ম-জনিত হোক বিরাম !
বিশ্বশান্তি কেবল ধ্যেয়,
প্রেয় নিক টেনে নিজেতে শ্রেয়,
লোক-সংহতি হোক অজেয়,
শুচি হোক জন-বসতি, গ্রাম !
ধরা প্রশান্ত নীল গগন,
সবুজ সাগর ধীর গহন
ধীর হোক গিরি নগর বন
জনভূমি হোক শান্তিধাম !

ধ্বংসশেষ

(অণু-বিনাশ)

পদ্যাংশ

গান

মেদিনী খুঁড়ে যা, সার সন্ধান কর!
চূর্ণ চূর্ণ করে দে রে অভিমান,
খণ্ড খণ্ড করে দে বহির্জ্ঞান,
আত্মরতির ভেঙে দে স্বগত-ধ্যান,
শুধরে নে তোর বাহিরভ্যন্তর।
কেবল বাইরে করিসনে ছুটোছুটি
ভিতরে ফিরিয়ে রাখিসনে আঁখিদুটি
এক-সাথ করে জুড়ে নে সূত্র দুটি
বাড়িয়ে নে তোর জীবনের পরিসর।

একটি কণ্ঠস্বর

মানুষ গড়েছে ঢের দর্শন বিজ্ঞান নিজ হাতে,
স্বহস্তে বেঁধেছে রীতিনীতির মর্যাদা শত শত,
সমাজে চলিত করে এসেছে সে হাজার পদ্ধতি—
নগরতন্ত্র ও রাজতন্ত্র থেকে বহু-নিয়মিত প্রজাবাদ।
কিন্তু হায় মৃত্তিকার তমসাবলীন অহঙ্কার
আজও যে হয়নি তার অন্তরের প্রকাশে দীপিত,
জড় নির্মমতারে সে প্রীতি-বিদ্রাবিত করে আজও
পারে নি সাজিয়ে দিতে প্রসারিত জীবনশোভায়!

জাতি-বর্ণ, বর্গ বা শ্রেণীর স্নবিধার অন্ধকার
মুহূর্তখণ্ডের যত সংস্কৃতির বিচিত্র সংস্কার,
রাষ্ট্রের দুঃসহ স্পর্ধা, বিভিন্ন মতের বিরোধিতা—
সারা জগতে সে মানবতায় পারে নি ঢেলে নিতে !
সংস্কৃতির মুখোশ লাগিয়ে ছল সভ্য বেশে বিগত যুগের
মানুষ রইলো ন্যুব্জ মেরুদণ্ডী পশু-মাত্র হয়ে।

আরেকটি কণ্ঠস্বর

দেখ হে, যুগলমূর্ত্তি লুণ্ঠিত পুঞ্জিত পড়ে আছে
ঘৃণিত, যমজজাতকের মতো আর্ত ম্রিয়মাণ,
বর্বব গর্হিত তার রূপ, বামনাকৃতি চেহারা,
বঙ্কিম ভ্রূকুটি, দর্পোন্নত শির, বিস্ফারিত আঁখি,
রক্ত-সিক্ত পৃথুল দু-হাত, নাসা স্ফূরিত সরোষে,
গুরু ও কুৎসিত পদভারে তার নিস্পিষ্ট মেদিনী !!

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বব

রাজনীতি ও অর্থনীতিব এই প্রতিমা দুখানি,—
নিত্য যারা রয় সাথে সাথে গলা জড়িযে স্বার্থের,
সাজায় দুরভিসন্ধি, কুচক্র রচনা করে মানবজগতে,
শুধু আন্দোলন শুধু সংগ্রাম সূচনা করে রাখে নিরন্তব,
ভুঞ্জে নব অধিকার জনসংঠন-শীর্ষে বসে !
দোহারা চেহারা, কিন্তু ক্ষমতায় তাবা মহাকায়—
অণু-বল সংগ্রহ-সঞ্চয় কবে মহাধ্বংস এনেছে জগতে !
চূর্ণ চূর্ণ করো ওগো এদের রূপের শেষ স্মৃতি,
মাটির দানবদেব মাটিতে মিলিয়ে যেতে দাও,
বহির্জগতের অন্ধ তমসায় থাক পথহারা
পৃথ্বী ও প্রাণের এই ঘাতক, নির্মম যুগ্মপ্রেত !

গান

সন্ধান কর সমুদায় অন্তর !
প্রকাশ-দীপ্তি অমায় লুকোনো আছে,

সৃজন-বিকাশ নিহিত প্রলয় মাঝে,
মরণ বিলাস অমরগণের কাছে
নয়কো অসার ধরার এ পরিসর !
দেখ শীতে নববসন্ত অকপটে
সীমার মাঝেই চির অনন্ত রটে
দেখ বিকশিত নবদিগন্ত পটে
যুগপ্রভাতের মুখানি, স্মিত অধর !

একটি কণ্ঠস্বর

রাশি রাশি অন্ধকার সরে যায়, ফেটে ওঠে ধূমল পাহাড়,
হৃদয়গগনে ভাসে উদয়ভানুর স্বর্ণভাগ,
নবচেতনার সৌরকিরণে দীপিত আশাগুলি
দেখ্ নেমে আসে ওই দিব্য-জ্যোতি মানসশিখরে !

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর

এ কার প্রতিমা—এই স্বর্গীয় বিভায় বিমণ্ডিত !
চারু অবয়ব যাব নির্মিত জীবন-সুষমায়,
আয়ত কোমল চিত্ত স্পন্দমান জগৎপ্রীতিতে,
করুণা-দ্রাবিত দৃষ্টি, জ্ঞানদীপ্ত মেধা সুপ্রখর,
দক্ষিণ হাতে অভয়, বাম হাতে সঞ্জীবন নিয়ে,
পৃথিবীর কীর্ণ তমসায় নেমে এসেছে এ কোন সুরবালা ?
ওরই তনুবিভা লেগে কান্তিমান ধরণীর ধূলি,
অতল অন্তরে ফুলে ফুলে ওঠে নবচেতনার সিন্ধুজল !

তৃতীয় আরেক কণ্ঠস্বর

সাক্ষাৎ মাত্রেই মন চিনে নিলো তারে লহমায় !
এ যে নবজ্যোতির্দেহা কান্ত সেই সংস্কৃতি-প্রতিমা,
তার আপনারই অন্তরুদ্ভাসে সে যুগ-যুগান্তরে
জানি নেকী গূঢ় রহস্য নিয়মে রূপান্তর করে পরিগ্রহ !

যখন নিজেই যুগবিপ্লবে বহিঃশক্তিগুলি
ধ্বংস-ভ্রংশ হয়ে যায়, অশান্ত সংঘর্ষে অবিরত,
তার নিজ অন্তরের শাশ্বত প্রকাশে এই নবজীবনেরে
নব চেতনায় বলীয়ান হয়ে রচে দেয় সে নব মানস!
সমাহিত-সম পড়ে রয়েছে সে আত্মপরিলীন,—
ওকে দেখে কেব পুনরুজ্জীবিত হয়েছে হৃদয়ে
নবীন জীবন, নব জ্যোতিপ্রীতি, শ্রী-সুখের আশা!
যার পূত সুধা-স্পর্শে ধ্বংসের উপান্ত্যে ফোটে সেই
নবীন ভূস্বর্গ জনমানসের প্রান্তিক বলয়ে।

(আশা-আনন্দ-উৎসাহদ্যোতক বাদ্য-সঙ্গীত)

সৌবর্ণ

অন্ত্যাংশ

দেবদূতী

নিশি ক্রান্ত হয়ে এলো! যুগবিকাশের স্বর্ণক্ষণ
মন মুগ্ধ করে যায়, রুপা-নিক্কণিত স্বর-সঙ্গতি চিক্কণ
চেতনাতপেব মতো অলঙ্কাব উরসে সাজিয়ে!
নিস্তব্ধ রক্তাভ উষালোক রক্তকমলেব মতো
স্মিতাস্য পাপড়ির পব পাপডি খোলে,—নিখিল দিগন্ত পল্লবিত।
চন্দনতরুতে শ্লিষ্ট পারিজাত মন্দার লতিকা
মুগ্ধা কিশোবীব মতো থরোথরো শিহবে দাঁডায়ে,—
অশোক ফুলন্ত হয়ে ওঠে সুন্দরীর পদাঘাতের স্মৃতিতে,
দেবদারু চূড়ায়-চূড়ায়-দেখ—লেগেছে স্বর্ণের সেই প্রভা!
স্বর্গ অবিরত আছে দেবতার সন্নিধি, নিশ্চয়,
তপোভূমিগুলি রূপান্তব করে অলৌকিক সৃজনভূমিতে!
শোনো—সৃষ্টি-প্রতিমান জাগবণ গায় বৈতালিক
সুবে সুরে কমলদলের কৃতাঞ্জলিগুলি পূর্ণ করে দিয়ে!

(প্রভাতের বাদিত্র-সঙ্গীত তৎসহ সমবেত গান)

রক্ত কমল, শুভ্র কমল
মেলেছে জ্যোতির্দৃষ্টি নওল!

রক্ত কমল প্রাণ-বিহসিত,
শুভ্র কমল শান্তিজনিত,

হৃদয়ে বিকাশে কিরণ-স্ফুরিত
আগুনের ফুলদল !

সুনীল কমল শ্রদ্ধাবিনত,
স্বর্ণ কমল ভক্তিপ্রণত,
পাকে ফুটে, প্রীতি-সুধার সতত
ভরে অন্তস্তল !

অমিত সুরভি কীর্ণ এখন,
জনপদে ওঠে কলগুঞ্জন,
স্বর্ণলহরী করে আলোড়ন
জীবন সরসীজল !

নবচেতনার জেগে ওঠে সাড়া,
অসীমেরে ছেয়ে শোভা মাতোয়ারা,
এলো নব ভোর, ওগো দেবতারা,
গাও জনমঙ্গল !

সৌবর্ণ

(আত্মবিশ্বাসভরা সৌম্য স্বর)

আমি সে সৌবর্ণ, আমি লোকজীবনের প্রতিনিধি !
নবীন মানব, জনজীবনের গরিমা-মণ্ডিত,
যুগ-মানসের পদ্ম, মেদিনীর পঙ্কে ফুটে ওঠা,
জড় চিত্তেরে করে যে সজীব সৌন্দর্যে সম্পূরণ !
এক ও আদিম, আমি অখণ্ডিত সত্য, জড় চেতনা আবারও !
আমিই প্রকাশ মূর্ত, স্থূল জগতের সূক্ষ্ম শোভা—
শতরঙ্গী ছায়াতপে বিকশিত ! আমি মর্ত্যলোকের অমর,

হৃদয়াভ্যন্তরে যার সহস্র স্বর্ণিম ভাবীযুগ
নবীন প্রাণশোভায় সিন্ধুজল-সম স্পন্দমান,
আমার চেতনা-স্পর্শে বিশ্ব অনুপ্রাণিত সতত !

জীবন-পাদপ আমি হরিৎ-প্রাণা,—মূল সত্য আমি,
দৃঢ় স্কন্ধ আমার সংযম, তার শাখা মোর সংকল্প মহান,
ফুল ফুল্ল মোর মন, রঙিন পাপড়িগুলি সূক্ষ্ম ভাব-স্মিতি,
সুরভি চেতনা, তার বিকাশ আমাব সুখ, মধু মোর প্রেম-মর্মধন,-
আশা-আকাঙ্ক্ষার অলি-গুঞ্জিত সে মধু চিরন্তন !
এই নবযুগে আমি জনমানবতার প্রতীক,
জ্যোতি-প্রীতি, আনন্দ-মধুরিমায় নব স্পন্দমান !
নবসংস্কৃতিব আমি সারথি, নবীন আধ্যাত্মিকতাও আমি,
আমি নববিকশিত পঞ্চেন্দ্রিয়, মনে প্রাণে অমিতচেতন !
আমায় বোঝেনি যারা তত্ত্বরূপে, তারা আজ এসে
দেখুক আমায় স্পষ্ট নব জনজীবনে মূর্তিত !

শতাব্দীর শিশির ঋতুতে ভরে দিয়ে যেতে এসেছি এখন
নব বসন্তের অগ্নি-পল্লবিত গুঞ্জিত মাধুরী !
ভুবনের চেতনা-সপ্তক তার অক্ষয় বৈভব আমি আজ
রূপায়িত করে যেতে এসেছি লৌকিক চেতনায় !
এক বসুন্ধরার জীবনে আমি সর্বমানবের প্রাণে-মনে
রুচি-স্বভাবের বিচিত্রতাগুলি সংযোজন করে নবভাবে,
যুগ-যুগান্তের যত মানসসঞ্চয় সব সমীকৃত করে
বিতরণ করে যেতে এসেছি নবীন মানবতার মাঝারে !

জিজ্ঞাসা

এ কোন স্রোতোধাবা !
কোন আকাশের গোপন গুহাহিত
অবাক চূড়ার তলায উৎসাবিত ?
কোন সমতল-দেশ বেযে দেয ভবে
কলধ্বনি, রজত ফেনা, মোতি !

বইছে ও কোন স্বচ্ছ মহিমায
অতলতার মৌন নীলিমায ?
বইছে ও কোন সুখেব রভসরসে
স্বর্ণ ঢেউযের কাঁপন-জাগা নদী !

এ কোন স্রোতোধারা !
কিরণ আলোর বৃন্তে বিকশিত,
ভাবেব স্বপনফুল শতরঞ্জিত,
মনলহরীব বিস্তাবে বিস্মিত
বক্ত হলুদ শুভ্র আনীল জ্যোতি !
মগ্ন হয়ে অনামা সৌরভে
দিগ্‌বধূদেব আঁচল ওড়ে নভে,
বিলীয়মান রহস্য গুঞ্জনে
নীরব মনস্তলের পরাগতি !

এ কোন স্রোতোধারা !
আযুগ্ম সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—

রুপোবরণ একজোড়া রাজহাঁস
বাইছে সাত্ম হৃৎসরসীর জল
হেলিয়ে গ্রীবা—শুভ্র সোনার রঙ!
অপরূপের দিব্য উড়াল ঝরে
মন অপলক হঠাৎ ওঠে ভরে,
অলিখিত গীতের প্রিয় কলি
বাজায় নতুন ছন্দেব নিক্কণ !

সীমার তটবন্ধ দিল ভেঙে
এক মুহূর্তে পুলক জোয়ার এনে,
উঠলো জেগে অতল নীলের থেকে
নামরূপাসীন মূর্ত চিরন্তন !
এ কোন স্রোতোধারা।

জন্মদিবসস

(২০শে মে ১৯০০)

হায়, কেটে গেছে আজ চুযান্ন নিদাঘ,
জীবন কলস পূর্ণ কবে
আজ ক্রান্ত হয়ে গেছে চুযান্নটি মধুর নিদাঘ!

বিগত যুগে সেই ঐশ্বর্য-চিহ্নেব মতো, বসন্তের শেষ
তামাটে-সবুজ ক-টি পল্লব, সোনালি ক-টি কুসুমকোরক
সঙ্কুচিত হয়ে, ডালপালার উপরে থমকে থেমে আছে,
রজত কুয়াশা-পটে লিপ্ত হয়ে আলসজড়িত,—
যখন ধরায় শিশু প্রথম মেলেছে তাব আঁখি!
(আগুনতরুর ডালে তখন কি ডেকেছিল পিক ?)

বিজন পাহাড়ী প্রান্ত সেই, ছিল হিমালয়েরই অঞ্চল,
আমার বাল্যের স্নেহ-ক্রোড় গিরি-পরীদেব প্রিয়স্থল,
সে ধূপছায়ার স্বপ্ন-নীড় শ্যামলিম, স্মৃতি-সুকোমল,
বনফুলে-রচা গন্ধ-দোল, বসন্তের চপল মলয়!
ছিল নব প্রভাত তখন, নব জীবনের সূর্যোদয়,
বিগত শতক ভুক্ত-প্রায়, যুগ-সন্ধিমুহূর্ত তখন।
সজল-পলক তৃণতরু শ্যাম ছিল শিশিরের রঙ,
শিশু তার প্রাণের সম্বল পেয়েছিল মায়ের আঁচলে
যবে তা মিলালো,—বলো যা-ই, ভাগ্য-ছলে কিংবা বিধি-বলে!
এসেছিল জন্ম ও মরণ সাথীর মতন একসাথে,
মরণের অঙ্ক ভরে যবে জীবন উন্মীল হলো প্রাতে!

হায়, সমদর্শী বসুন্ধরা! বিষণ্ণ অঙ্গনে দিব্যধাম!
আরক্ত মুকুলে ভরে গিয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে বাদাম!
রাশি রাশি আপেলের কুঁড়ি রক্ত ছিট্-লাগা, সুশোভন,
মুগ্ধ করেছিল মন-তার রুপো-রঙ মাঝারি ধবন।

মূক শৈল-প্রকৃতির বুকে নবাগতদের সুস্বাগত,—
বহু পরে কিশোর বয়সে অনুভব করেছি সতত!
শুতো কি না কে জানে, চেঁচাতো ধোঁয়াশে কালুয়া সারারাত
প্রকাণ্ড ভোটিয়া শের, একা যুঝেছিল সে বাঘেরও সাথ।
শী শী সিটি বাজিয়ে আসতো মঙ্গল বাবুর্চির দুষ্টু ছেলে
হয়তো খাবারের থালা নিয়ে, কিংবা খুশি পয়সা হাতে পেলে।
পিঁপড়ের মতন সারে সারে ছড়ানো বাগান-ভরা মালি
সবুজ চা-য়ের ছোট ছোট কুঁড়ি তুলে ভরে নিতো ডালি!

আজও কেউ কাটছে নিশ্চয় যবের গমের সব ছড়া,
কোমরে নিড়েনি গোঁজা তার মাথায় সোনার ঝাঁকা ভরা,
মখমলি চোলিতে গা সে ঢেকে চলেছে খেতের পানে ভোরে:
গাঁয়ের সরলা বধূ তার ছিট্-দেওয়া শাড়িটি বেঁধে পরে!
কাঁধের টাঙীটা নীচে রেখে, টিলার মাথায় দেহ ঢেলে,
কানে হাত চেপে, গলা খুলে গাইছে বুঝি বা গাঁ-র ছেলে!
সবুজ-সবুজ ঘাস কেটে নিচ্ছে সে নোলক-পরা মেয়ে,
চোখে তার সবুজ আবেশ বুঝিবা পিয়ার পথ চেয়ে!
কারো বা গলার দীর্ঘ তান মিলে যায় পাহাড়ি মর্মরে,
মধু-প্রতিধ্বনি জাগে তার উপত্যকার অভ্যন্তরে!

'মেঘে মেঘে বিজুরি প্রলাপ
আগুন লেগেছে বনে ফুটন্ত বুরুসে—
—তনু-শরীরে তোমারও বহ্নিতাপ!
শিলে পেঁষো কেমন মেহেদী,

তোমার মনের রঙ ভেঙে দেখো—
—আমার এ মন শূন্যবেদী!
দিন ঢেকে ঘনমেঘভার;
হে নবীনা, বাড়-বয়সের এক মুহূর্তেই—
—নেমে যায় জলের জোয়ার।'

বুঝি দেয় সুন্দরী সরবে
মিঠা স্বরে প্রেম-ভরা গালি,—
কী খেয়ে, ওরে ও ভুখা-মরা
করবি আমার রাখোয়ালি!
শাশুড়ি আমার সিংহী-সম,
শ্বশুর একাই একশত,
ভাশুরেরা শক্তি-মাতোয়ালা,
দেওর আমার নম্র-নত!
স্বামী কামধেনুর সমান,
আহা আমি যাই বলিহারী,
আমি ছন্দ তিনি সে চন্দন,
তিনি চাঁদ আমি জ্যোৎস্না তাঁরই!
তিনি মৃগ আর আমি মৃগী,
দোঁহে পান করি ঝর্ণাপানি,
পিপাসু তো খোঁজ্ জলধার,
ওরে মূঢ়, ওরে বকধ্যানী!
যেন গুঞ্জরিত গিরি-বনে—
গগনে-গগনে দুটি তান,
হয়তো আজও সে-স্বপ্ন-সাধে
দুঁহু করে দোঁহার সন্ধান!

উষা স্বর্গ-ক্ষিতিজে তখন
স্বর্ণিম মঙ্গলঘট ভরে
সূর্য-মণি-মুকুট মাথায়
নেমেছিল উদয়শিখরে!
জেগেছিল আগেই পাখির।
গিরিশিরে বাসের কারণ,
গেয়েছিল নব স্বর-লয়ে
নবজাগরণের চারণ!
প্রতীক্ষা নীরব আর নীল,—
অনুরাগ-দ্রব দু-নয়ন,
হিম-গন্ধে গাঁথা রেশমিয়া
বস্ত্র-সম মসৃণ পবন!
নানা-রঙা বন-ফুলে ছাওয়া
প্রসারিত মখমলী শাদ্বল
পেতে রেখেছিল শৈশবের
স্মিত শেজ, লীলা সুকোমল!

পাশেই দাঁড়িয়ে হিমবত
মাথা উঁচু করে সগৌরবে,
দিয়েছিল তার আশীর্বাদ,
অপূর্ব সে নব-জন্মোৎসবে!
হেম শুভ্র চূড়ার উপরে
নেমেছিল মৌন তন্দ্রাহর
জ্যোতির্দেহী চিত্তালোক-সম
দিক-প্রহাসিনী দিবাকর,

তল হতে ক্রমোর্ধ্ববাহিনী উড়েছিল নীহার-কেতন,
কেঁপেছিল শুভ্র ছায়াতপ জলেছিল রশ্মিতে চেতন।
কালদংষ্ট্রা হতে উজ্জীবিত জন্মেছিল শতাব্দ নবীন,
স্নেহপূর্তি-সম গত শতী কৃচ্ছ্র-বেদনায় মূর্ছালীন।
শিশুরই নিমিত্তে—নবযুগ নেমে এসেছিল সুনিশ্চয়,
বহিরন্তরের অমা চিরে বিহসিত নব-স্বর্ণোদয়।
বুঝি এরই জন্য, হিমাদ্রির স্বর্গোন্মুখ ক্রমাবরোহণ
যুগের সোদর শিশুটির ছিল সুমহান আকর্ষণ।

অবিশ্রাম ডেকে ডেকে কাক গেয়েছিল উঠোনে স্বাগত,
তখন নিশ্চয় ছিল তার গুহ্য শক্তি অলক্ষ্যে জাগ্রত।
অবচেতনা বা নিশ্চেতনা— হতে চেয়েছিল যুগবিমথিত,
মন ছিল উন্নীত হবার জড় অণু—দেহের জ্যোতিত।
খণ্ড পর্ণ, রুদ্ধ উন্মোচিত, যা চিরবিভক্ত যোজনীয়,
ধরণীর বিরোধসমূহ বিশ্ব-ঐক্যে ছিল স্থাপনীয়।
কুশ্রীর সুন্দর, সুন্দরের কাম্য ছিল সুন্দরতরতা,
মঙ্গল মঙ্গলতর হতে, লোকসত্য মহত্তর সদা।

শুধু কোনোখানে ঘোর করে এসেছিল ক্রান্তির জলদ,
বিশ্বের নব-জীবন বহি যেন রক্ত-শিখার পরত।
ফুলে ফুলে উঠে ক্রুদ্ধ ধরা ভয়ঙ্কর হুঙ্কারে হুঙ্কারে,
রুদ্ধ জঠরের অগ্নিরাশি চেয়েছিল উঠাতে উৎসারে।
ঋতুফুলে গুঞ্জিত, ঝঙ্কার সেটি ছিল জন্ম-দোলা, তাতে,
—প্রভুর কি দয়া!—ঝুলেছিল সৃষ্টি ও প্রলয় একই সাথে।

হায়, কেটে গেল আজ চুয়ান্ন নিদাঘ,
সুধা ও বিষের মিঠা আর তিতা কুম্ভ রিক্ত করে,—
আজ ক্রান্ত হয়ে গেল চুয়ান্নটি মধুর নিদাঘ।

শান্তি ও ক্রান্তি

শান্তি চাই শান্তি! চাই রজত প্রশান্ত অবকাশ
মানবের, ওই মন: ওর চাই মহৎ প্রকাশ,
সে যে আত্মা: চাই তার অন্ন, বস্ত্র, নিভৃতনিবাস,
দেহীও সে: মুখ্যত—ও আজ দেহী, একদণ্ডভর—
হৃদয়বিলাসী,—কাল হবে ও আত্মায় রূপান্তর!

হা, অভাগা, বড় নিঃসহায়ে আজ জড়িয়ে গিয়েছো বাহিরের
জড় পৃথিবীতে, ওই বহির্জীবনেই দাম দিতে হলো ঢের,
যেথা যুগান্তের গাঢ় আঁধার প্রচ্ছায়া বিসারিত!
মানুষের ভিতরজগৎ তার ভিতরজীবন যেন আজ
রিক্ত, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, ছায়ায় নিমগ্ন, জীবন্মৃত—
পুরোনো সংস্কারের প্রেত-প্রপীড়িত!

মনে মনে অনুমান করি,—শুধু দেখি না কোথাও স্পষ্ট করে,
তবু জানি মহান যুগান্ত এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের দোরে!—
বিবর্তিত হয়ে যায় মানুষের জাগতিক, কায়িক, প্রাণিক,
সূক্ষ্ম মানসিক স্তর, অগোচর অধ্যাত্ম ভুবন
বিবর্তিত হয়ে যায়, অসংশয়ে, মানুষের ঈশ্বরও এখন,—
যে দেবতা যুগ-যুগান্তর ধরে করে এসেছেন নিয়ন্ত্রণ
মানব-পৃথিবী, এই লোকবিধি, মন ও জীবন!

জৈব স্থিতি হতে উঁচু ভাগবত-প্রস্থান অবধি
যুগবিবর্তন-চক্র ঘোরে ওই অবাধ সম্প্রতি!

আজ ঘোর জনকোলাহলেরও ভিতর
কানে বাজে শব্দহীন অতন্দ্রিত সঙ্গীতের স্বর
গুঞ্জন ছড়িয়ে চলে মনে মনে অনন্ত প্রহর।

কবির কল্পনা নয়,—অভিজ্ঞতাবাহিত বাস্তব.
ঘোর বিভ্রমের যুগে ও সত্য অভ্রান্ত অনুভব,
যে সত্য হৃদয়ে বয়ে মানবচেতনা ওই ঊর্ধ্বে উঠে যায়
নিরন্তর এক চূড়া থেকে আর নতুন চূড়ায়, তার ওঠায়-পড়ায়
সংঘর্ষমুখর, আর্ত,—দেয় তারে চির-অপরাজিত আসন
পরিণামে। এরই জন্য শান্তি-ক্রান্তি, সংগ্রাম সৃজন,
বিজয় ও পরাজয়, প্রেম-ঘৃণা, আর সেই উত্থান-পতন,
আশা-কুণ্ঠা, সুন্দর-কুরূপ যত আছে এ যুগের
সব এই বাহু-লগ্ন করে তুলে নিয়েছি,—তাদের
পরস্পরপূরক, অভিন্ন, এক মেনে এই বিবর্তনক্ষণে
হাসি ও অশ্রুর মাঝে একত্রে নিয়েছি ধ্যানাসনে।
বিস্ময় মানিনে, যদি বিবর্তিত হয় এ সমাজ.
আর্থিক, ধার্মিক, ব্যক্তিনির্ভর মানুষ, যদি আজ
সমাজ বাহৃত হয় সামূহিক আর শ্রেণীহীন,
যদি নষ্ট হয়ে সমাজের বিগত বিন্যাস।

এরই মাঝে ফিরে আসে নৈতিক অতীত: মনোবাদী,—
দীপ্ত হয়ে ওঠে ফের নতুন সুষমা, নব আদর্শের স্তব।—
যেন আজ মানুষের নতুন ঈশ্বর
নেমে এসেছেন বাহি স্বর্ণরশ্মিসম স্মিত প্রত্যূষার রথ,
নেমে এসেছেন যেন তড়িৎ-স্ফুরিত লতা-আশ্লিষ্ট পর্বত,
অগণিত সুরবীণা-ঝঙ্কৃত নির্ঝর,
উন্মাদ ভৃঙ্গের মধু-গুঞ্জনে দোলিত পুষ্পাকর।

চারিদিক ভরে যায় সহস্র শীৎকারে, শীত গত,
মনে মনে জ্বলে নববসন্তের দিব্যাগ্নি সতত!
বিবর্তিত হয়ে যায় মানুষের ঈশ্বর এখন,
মানবতা, মানুষের মন!

সোনালি জুঁইয়ের লতা

সোনালি জুঁইয়ের নব বল্লরী,
বছরের এক ধন্যা বনজ, পুলক-বিকচ, দ্রুত গেল ভরি,-
সোনালি জুঁইয়ের নববল্লরী!

আগুন বেড়ার পরে চড়ে এসে
দারু থামটির গলা জড়িয়ে সে,
আড়ায় কনুই ঠেস দিয়ে হেসে
দাঁড়ালো আলসভরে সুন্দরী!
সোনালি জুঁইয়ের নববল্লরী!

এক পায়ে গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে
মুগ্ধা বয়স পার হয়ে গিয়ে,
রোগা পা-র পরে তুলে আর পা-টি,
হাঁটু মুড়ে, যেন ছবি পরিপাটি,
পল্লবদেহী মৃদু সুকোমল,
ঠেলে দিয়ে ধূপছায়ার আঁচল,—
ঝিনুকের পাখা মেলে মধুবায়ে
বনের সবুজ পরী আঙিনায়
পায়ের আঙুল ভর করে উঠে
উড়ে যেতে চায় যেন নভ ছুঁতে।
সোনালি জুঁয়ের লতা একগুঁয়ে
ঠোঁটের উপরে সোজা পড়ে নুয়ে!

ঝালর-দোলানো ঘাগরা পরেছে
সোনালি কুঁড়ির গহনায় সেজে
বুটিদার চেলি হাওয়ায় ভাসিয়ে
রূপলহরের লহর কাঁপিয়ে,—
তারার মতন শ্যামছায়া মেলে
পাগল—সিধে সে চলে না পা ফেলে,
কোমলতা-ভারে যেন মরে যায়
কৃশাঙ্গ তার কাঁপে দ্যোতনায় !
বন জগতের যেন নির্ঝর
সবুজ ঝরণা, চলে শাখা-ভর !
সোনালি জুঁইয়ের লতা চলে ভেসে,
যেন চঞ্চলা হরিণা ছুটেছে !
বাসনার মতো লিপ্ত হিয়াতে,
গ্রস্ত প্রাণের তমোকণিকাতে,
ভূ-যৌবনের যেন সে বিকাশ,
মধুস্বপ্নের যেন প্রতিভাস,—
মেরুদণ্ডের নির্ভরতায়
দিকে দিকে ধায় চেতনা বিলায়—
আহা, বিকাশের পথে নিয়ে চলে জীবন লহরী
সোনালি জুঁইয়ের নব বল্লরী !

এই ধরিত্রী কতো-কিছু দেন

ছোটবেলা আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পয়সা রুয়েছিলাম,
ভেবেছি তা পাবে পয়সার গাছে একদিন পরিণাম,
টাকার মধুর ফসল উঠবে গোলাভরা গুঞ্জনে,
আর, হু হু করে বেড়ে উঠে, আমি মোটা শেঠ যাবো বনে!
হায় বাঁজা ধরা, ধরলো না তাতে এক কণা অঙ্কুরও,
বন্ধ্যা মেদিনী জন্ম দিলো না একটি রুপোর কুঁড়ো!
শেষে সমাপন হলো সে স্বপন, ধুলোয় ধুলোর গুঁড়ো!

সেই থেকে আজ আধশো বছর কেটে গেছে হু হু করে।
কত মধুঋতু, কত পতঝর কেটে গেছে অগোচরে:
তাপিত গ্রীষ্ম, বরিষা-ঝুলন, স্মিত হাসি শারদীয়া
হী হী-কাঁপা শীত, বনানী পলিত, আবার চৈতী প্রিয়া!
শেষে যবে ফের গাঢ় লালসের আকুলতা নিয়ে মনে
গহর কাজর মেঘ নেমে এলো থরশর বরিষণে,
আমি কুতুহলে উঠোনের কোলে তারই এতটুকু ভিজে
মাটিতে আঙুল বুলিয়ে বিঁধিয়ে সরানো মাটির নীচে
কী জানি কী ভেবে বসিয়ে দিলাম শিমদানা এক ডালা—
ধরার আঁচলে মনে হলো বেঁধে দিলাম মাণিকমালা!
ফের কবে যেন ভুল হয়ে গেল ছোট্ট ঘটনা—ভাবি
স্মরণে রাখার মতোই বা তার কতটুকু ছিল দাবি!
কিন্তু আবার একদিন যবে সন্ধ্যার আঙিনাতে
ঘুরছি—সহসা পড়লো যা চোখে, যেন এক লহমাতে
বিস্ময়ে বনে গেলাম বিমূঢ়—হর্ষের সাথে সাথে!

দেখলাম যেন উঠোনের কোণে কটি শিশু নবাগত
ছোট ছোট ছাতা মেলে ধরে ধীরে দাঁড়িয়ে নম্রনত।
জানি নে তাদের ছাতা বলবো না বলবো জয়পতাকা,
বা তারা ওদেব ছোট সুন্দর করপুট মেলে রাখা
যা-ই হোক মনে হলো যেন গাঢ় উল্লাসে অবিরত
সবুজ সবুজ ডানা মেলে ওরা উড়ে যেতে উদ্যত :
ডিম-ফুটে সবে আলোয় আগত বিহগশিশুব মতো!

এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম নির্নিমেষে—
সহসা স্মবণ হলো, একদিন কিছুদিন আগে—এসে
আমি রুয়ে গিয়েছিলাম উঠোনে শিমের বীজ তখন,
তারই থেকে এই তরুশিশুদেব বংদাব পল্টন
আমাবই চোখেব সুমুখে দাঁডিয়ে বয়েছে গর্বে আজ,
ছোটো ছোটো খাটো পা ফেলে পা ফেলে কবছে কুচকাওয়াজ!

সেই থেকে চেয়ে দেখছি ওদের, ধীবে ধীরে অনিবাব
অগুন্তি পাতা বোঝাই চাপিয়ে ভরে গেল ক্রমে ঝাড,
মাথায় টাঙানো হলো মখমলী সবুজ চাঁদোয়াগুলি।
লতা এঁকে বেঁকে গেল বিসারিয়া আঙনে লহর তুলি,—
আব সে বেডার বাঁশের সহায় যেচে নিয়ে শত শত
সবুজ ফোবাবা উপর দিশায় ফুটে পড়ে অনাহত,—
দেখছি অবাক, কী ভাবে বংশ বেড়ে যায় অবিরত!

আহা, কত ফল ফলেছিল সেই গাছে যে সময়কালে!
কত অগুনতি মনোলোভা ফল ফলেছিল ডালে ডালে,—
চিকণ চওড়া ফলগুলি! আহা, কী ফল ছিল কপালে!
অজস্র ফল, সারা শীত ভরে খেলাম, সকাল সাঁঝে
বাড়ি বাড়ি তার হলো ব্যঞ্জন, প্রতিবেশীদের মাঝে
জানা-কমজানা—সবাইকে বেঁটে দিলাম কোঁচড় ভরে।

সারা পল্লীর বন্ধু অতিথি মিত্র যাচক—দোরে
যে এলো সবাই নিয়ে গেল খেল প্রাণ ভরে অবিরল !-
কত অজস্র ফল, এক গাছ কী যে সুন্দর ফল !

এই ধরিত্রী কত দান দেন ! ধরিত্রী মাতা তাঁর
প্রিয় সন্তানদের ঢেলে দেন অফুরান উপহার !
অল্প বয়স, বুঝিনি তখন তাঁর মহিমার দাম,—
স্বার্থ-লোভের বশে আমি গিয়ে পয়সা রুয়েছিলাম !
এখন চিনেছি রত্নপ্রসবা ধরিত্রী জননীরে !
জেনেছি ধরায় রোয়া যায় শুধু সাঁচ্চা সমতা ফিরে,
জেনেছি ধরায় রোয়া যায় শুধু ক্ষমতা এ মানুষের,
রোয়া যায় শুধু সমতাব বীজ—যাতে জেগে ওঠে ফের
মাটির বক্ষে মানবতাবাহী সোনালি শস্যরাশি—
জীবনের শ্রমে দিকেদিগন্তে জাগানো অপার হাসি।
যেমন বপন করে যায়, পায় তেমনই ফসল চাষী !

কাকেরা, হাঁসেরা, ব্যাঙেরা

কোনখান থেকে সোনায বাঁধিযে আনলি তোদেব ঠোঁট
ওবে ও কাকেরা, ওরে ও প্রিয কাকেরা,
কোনখান থেকে সোলায় বাঁধিযে আনলি তোদের ঠোঁট।
কোন সে বার্তা নিযে এলি ঘরে ঘবে,
কী সুলক্ষণ, কোন সে অতিথিববে,
কালো পাখনায় আবছা আঁধার ঢেলে
মনেব বিক্ত উঠোনেব চত্বরে।
কোনখান থেকে সোনায বাঁধিযে আনলি তোদের ঠোঁট
ও প্রিয কাকেরা, অনন্ত ও কাকেরা ,
কোনখান থেকে সোনায বাঁধিয়ে আনলি তোদের ঠোঁট !
কেটে গেছে বাত। সোনালি প্রভাত,—আয ভাবি একজোট।

কোনখান থেকে হীরেয় জডিযে আনলি তোদের পাখা
ও শাদা হাঁসেরা, বাদামিবঙা হাঁসেরা,
কোনখান থেকে হীবেয জডিয়ে আনলি তোদের পাখা !
কোন ঝিল, তাব কেমন চেতনজল
যেথা ফোটে সেই স্বর্ণকমল দল,
পাপ-পঙ্কের চিররহনীয়া ওরে
কোথা থেকে পেলি পুণ্য ও তেজোবল !
কোনখান থেকে হীবেয় জডিয়ে আনলি তোদের পাখা
শাদা ভরন্তী বাদামিরঙা হাঁসেরা,
কোনখান থেকে হীরেয় জড়িয়ে আনলি তোদের পাখা !
এ নবদৃষ্টি ! পাপপুণ্যের ফল ? খোলো আঁখি-ঢাকা !

কোনখান থেকে গড়িয়ে আনলি কণ্ঠের বীণাখানি
ওরে ও হলুদ, মেটেরঙা ও ব্যাঙেরা,
কোনখান থেকে গড়িয়ে আনলি কণ্ঠের বীণাখানি!
পৃথিবীর উপচেতনার আবাহন
রহি-রহি উৎকণ্ঠা-দোলায় মন,
কী সাধ পূরাতে কারে শোনাবার তরে
রাখিস কী বা সে গোপন সম্ভাষণ?
কোনখান থেকে গড়িয়ে আনলি কণ্ঠের বীণাখানি
হলুদ, সবুজ, মেটেরঙা ও ব্যাঙেরা,
কোনখান থেকে গড়িয়ে আনলি কণ্ঠের বীণাখানি—
এ প্রেমতত্ত্ব! অগম ধরার সৃজনাশী মনোবাণী!

সমাচার

যেন ক্ষয়ে গেছি, মন উচাটন, জানিনে কখন
ঘুমিয়ে পড়েছি কাঠে এলিয়ে, অলস দুপহর,
দুঃস্বপ্নের ছায়ায় পীড়িত, বহুক্ষণ—যেন বহুক্ষণ
ডুবে গিয়েছিলাম গহন অবচেতনার নিদ্রার ভিতর !

সহসা দুচোখ মেলে দেখি বুকে বোঝার মতন
দুর্ভার নিরিক্ত অসন্তোষ এসে স্তূপিত হয়েছে !
জানিনে সে কোন কথা কাঁটায় কাঁটায় বেঁধে মন,
জানিনে সে কী কারণে চলেছিল হৃদয়মন্থন,
তিক্ত ফিকে অবসাদে পাকিয়ে-পাকিয়ে অনুক্ষণ !

সারাটা জীবন যেন এলোমেলো যেন বিশৃঙ্খল,
আমার ঘরটিও যেন পরিচিত ঘর নয় আর,
কিছুতে লাগেনা মন, উড়ে যায়—হতাশ বিকল !
কী যেন হঠাৎ হয়ে গেছে আজ নিমিষে আমার
যেন কোন অচিন্ সড়কে পথ হারিয়ে গিয়েছে আজ তার !

এরি মাঝে দুচোখ আমার হলো আলগ্ন মেঝেতে,
যেথায় শীতের শুক্ল ঢলমান রোদ
জানলার চৌকাঠ ছুঁয়ে ঈষৎ দীঘল আয়না যেন
একতাল গলন্ত রুপোর থেকে চলকে পড়ে কুড়োচ্ছিল আলো।
আজ জননগরীর অন্ধ গলিপথে তুমি হারিয়ে গিয়েছ,
বন্দী হয়ে আছ রুদ্ধ উচ্চপ্রাসাদের কারাগারে,

তুমি মিশে চলেছ কি তোমার নিজেরই চিন্তাতরঙ্গে কেবল,
লোকমান-মর্যাদার স্থূল দৃষ্টি পেয়ে কি তোমার
সূক্ষ্ম স্বপ্নদর্শী আঁখি নিমীলিত হয়ে গেছে আজ ?

এই নাও—আমি বয়ে নিয়েসেছি অসীমের বাণী
তোমাদের দেবো বলে, আবার দাঁড়াও মুক্ত নিসর্গের বুকে,
দিকে দিকে প্রসন্নতাভরা প্রাণ, অঙ্গনে আবার খেলো খেলা
যেথা নিরুদ্দেশ দিশা তা-ও লাগে মাধুরি জড়ানো !
ফের ঘোরো শাশ্বতের পথ ধরে স্বপ্ন সঞ্চরণে,
বাঁধো কল্পনার সেতু দূর ভাবিলোকের বলয়ে !
নিজেরে সর্বতোযুক্ত করে নাও বিরাটের সাথে
তারপরে ভালোবাসো, থাকো সুন্দরতাব প্রেমিক :
চিরকাল যে-সুন্দর স্বয়ম্পূর্ণ, উদ্দিষ্ট স্বয়ং !
ওগো কবি, এই জেনো জীবনের আদর্শ মহান্ !

আত্মিকা

[সংস্মরণ ও জীবন-দর্শন]

এক

নীল মহাকালের হর্ম্যের
ধ্বনি তুলে মৌন ঘরে ঘরে
তোমার ও প্রিয় পদচাপ
বাজে নিত্য মেঘমন্দ্র স্বরে !

আশৈশব শুনি ও সংবব
বিস্মিত পুলকে অফুরান,
অশ্রুত স্বর্ণিম পদধ্বনি
অন্তরে অন্তরে কম্পমান !

কোন দেবকন্যারা কে জানে
স্বপ্নে নেমে মোহে মোর মন
স্বর্গ-সুখ আশার মাধুরি,
ওষ্ঠাধরে করে চিত্রাঙ্কণ !

ছিল পরীদের সেই রুচিরাজগৎ নিরুপম
ধরণী ও জীবনের শুধু এক লঘু উপক্রম :
সেখানে চন্দ্রমা চুপি চুপি এসে কেড়ে নিতো মন,
চারিধারে ব্যাপ্ত ছিল মধুর মধুর আকর্ষণ !
তখন ছিল না জানা, আমারে ছাড়োনি এক লেশ,
পাশে পাশে চলে তুমি জানিয়েছ পথের নির্দেশ !

দুই

মুগ্ধ, স্বপ্নচারী সেই শিশু বয়সের পদধ্বনি
ক্রমে হলো কৈশোরের চপল সঙ্গীত,—
নব-বয়সের দিব্যমণি।

হিমগিরিতল ছিল দিকে দিকে ফুল্ল হরষিত,
প্রকৃতির ক্রোড় ছিল ঋতুসুষমায় সুরচিত—
রেশমি-বাতাস ছিল সুরভি গ্রথিত,
মুক্ত নীল পাহাড়ের ডানায় ডানায় সুখস্থিত।

হরিৎ সাগর-সম ব্যস্ত ছিল নির্জন অটবী
যেথায় পশিতে হতো ভয়,
ভাবমৌন গহন ছায়ার প্রতিচ্ছবি
কেঁপে কেঁপে ভরে যেত হৃদয়ে বিস্ময়।

সাঙ্গ করে ধরা-পর্যটন
হোথা গৃহবাসী ঋতুগণ
দুলন্ত শৃঙ্গার পাতা গন্ধ-বর্ণ-ধ্বনি গাঁথা
সেই স্থান হৃদয়হরণ।

তারপরে কবে আমি কিশোরবয়সে অগঠিত
পায়ে পায়ে হেঁটে গেছি ধরায়—সবার অবিদিত,-
ভব-বিকাশের পরিবর্তন সরণে
চলে কাল অদৃশ্য চরণে।

মধ্যবিত্ত গৃহসুখে জন্মেছি, পেয়েছি
মহামনা ধর্মপ্রাণ পিতা,
বাৎসল্যের অনন্য শিখর
গৌরদেহে শঙ্খের শুচিতা!

মা-হারা ছিলাম একা, মোর
সলাজ বাল্য তা অবগত
স্নেহাঞ্চল-রহিত, আত্মগ
ধাত্রীপাল্য, নম্র, ভাবরত।

প্রকৃতির অঞ্চলে লুকিয়ে মোর ক্রীড়াপ্রিয় মন
তৃণ-পাদপের বার্তা শ্রুতি ভরে নিতো অনুক্ষণ,
পাখির ডানায় ভর করে নীলিমার
পেরিয়ে যেত সে ছায়াবন!

কোয়েলা-কূজনে থেকে থেকে
মন মোর উড়ে যেত বনে
ঋতু-শোভা যেত বিসারিয়া
নিষ্পলক হৃদয়দর্পণে!

পুণ্যতীর্থ প্রভু হিমালয়
শোভিত পাবন তপোবনে,
যেথা নিত-বাসী সাধুজন
পরা-শান্তি, সত্যের কারণে!

চল-বর্ণা নিসর্গশোভায়
ছুঁতো মন, দিক মঞ্জরিত,
ধ্যান-বৃত যোগীমূর্তি হেরি
চিত্ত হতো সম্ভ্রমে মোহিত!

সহজে যায় না ভোলা চারু
কৈশোরের স্মৃতির দংশন,
যে বয়সে মনের গঠন,
যে রাঙায় জীবন-দর্শন!

ঊর্ধ্বারোহী হিমগিরিতলে
মণিকণিকার মতো গ্রাম :
শ্রদ্ধানত মুগ্ধা প্রকৃতির
সমর্পিত-সর্বস্ব প্রণাম !

স্বর্ণশীর্ষ হতে বৈভবের
দু-টি বিভা—সন্ধ্যা ও প্রভাত,
নিঃশব্দ নিসর্গ ধ্যানে তারই
পেতো দিব্য-রূপের সাক্ষাৎ !

মৌন শৃঙ্গ নীল ভিন্ন করে
জানি না কী জানাতো অন্তরে,
আকণ্ঠ আমার পূর্ণ হতো
অনন্তের নিহিত সে স্বরে !

রূপার্ত রহিতো দু-নয়ান
হেরি ক্ষীর-শিখর বারিধি,
শুভ্র এক সত্তার পরশে
অসীম অতল হতো হৃদি !

সুন্দরী প্রকৃতি যেন তার
স্পর্শে মোর ঘটালো সংস্কার,
দীপ্যমান স্বর্ণিম উৎসারে
গাঢ় করে অন্তর্মুখিতারে !

সে ঋষি-ভূমিতে কিশোরের
ঘুচে গেল সব চঞ্চলতা,
উচল প্রেরণা অন্তস্তলে
আলোড়ন ঘটালো সর্বদা !

ছিল বয়ঃসন্ধির আড়ালে
সংঘর্ষের পর্বত—যৌবন,—
মধু রঙ রস ফুলে গাঢ়
নব গ্রহ—আত্মসন্দীপন !

জিজ্ঞাসা-মন্থিত অনুক্ষণ
ভাব-যুদ্ধে রত সে তখন,
নবীন ইচ্ছার সহ দ্বন্দ্বী ছিল অহরহ
স্থিতি, বা জগত, বা জীবন !

নিরাবেগ, সতত অধীর,
চিত্ত ছিল ক্ষুব্ধ, ক্ষোভ মেলে,
অতৃপ্ত বিষাদ রহি রহি
গোপন প্রেরণা যেত জ্বেলে !

স্বর্গীয় শৃঙ্গের শীর্ষে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে মন
দুঃখের গহ্বরে অধঃপতিত হতো সে অনন্তর,
উত্থানপতনময় সেই জঙ্গমতায় লজ্জিত
হয়ে আত্মপরাঙ্মুখ হতো মোর আহত অন্তর !

রামতীর্থ, রামকৃষ্ণদেবের
অমিয়বাণীতে প্লুত দেশ,
পুনর্জাগৃতির যুগ জগতের হিতোন্মুখ
প্রাচ্য দর্শনের পরিবেশ !

খুলে মধ্যযুগের গুণ্ঠন
ঠেলে প্রত্ন-প্রথার বন্ধন
বিবেকানন্দের বাণী প্রাণ-সম্ভাবনা আনি
চিত্তে তোলে জলদগর্জন !

কর্ম ত্যজি বৈরাগ্যের ধ্যানে
চিত্ত মোর ছিল বীতস্পৃহ,
পার্থিবতা-চ্যুত ভাগবত
জীবন লাগেনি বরণীয় !

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ জানি
ভীরু মধ্যযুগেরই তা বাণী,
মনে হতো নিষ্কাম ভক্তিই
বুঝি সেই জ্যোতির্মাণখানি !

জীবনের বাসনার মুক্ত নাগফণাব উপব
সেই জ্যোতির্মণি রেখে অন্তব-ভাস্বর
মনে হতো প্রায়ই : এ ধরায়
মানুষের অন্বিষ্ট কোথায় ?

উপনিষদের মন্ত্র শুনে
ঝঙ্কাবিত হতো মন-দেহ,
ব্রহ্ম, সত্য, শাশ্বত, ঈশ্বর—
জিজ্ঞাসার সদা ছিল জ্ঞেয় !

এরই মাঝে বিশ্বযুদ্ধ-রব
দিশা ঘোর করে এলো কাণে,
নির্মম বিস্ময়ে কৌতূহলে
ফুঁসে উঠিলো তা প্রাণে প্রাণে !

—'পরাধীন ভারতজননী
দুঃখ তাঁর করো অবসান,
দেশহিতে হে নবযুবারা
দুঃখের জীবন করো দান !'—

নব-জাগৃতির এই বাণী
মঞ্চে হতো ভাষিত নিয়ত,—
গ্রাম থেকে শহরে তখন
ছাত্র আমি, অধ্যয়নরত !

পেয়ে দেশভক্তির সাথেই
মোহমন্ত্র মাতৃভাষারূপী
প্রকৃতির প্রেমরসে মগ্ন প্রাণ মধুপ সে
গুঞ্জিয়া উঠিলো চুপি চুপি !

হেরিলাম ফুল-স্তূপে ঢাকা
বঙ্কিমান স্বর্গের বারতা,
চেয়েছি যুগের পিক হতে—
জগৎ-চিন্তায় বাঁধা সদা !

নিসর্গসৌন্দর্য ফুল-সম
নির্ণিমেষ দৃষ্টির সম্মুখে
খুলে দিলো পাপ্‌ড়িভার, প্রথম ছন্দের হার
মধু-বর্ণে গাঁথা হলো বুকে !

চবিতার্থ হলো না হৃদয়ে
ধরা-স্বর্গ-নারীর প্রণয়,
দেহভারে রহিলো গুণ্ঠিত,
শোভা-স্ফূর্ত হলো না হৃদয় !

সে করুণ হৃদয়গুঞ্জন
মধুর 'গ্রন্থি'তে সগৌরবে
ধ্বনি-লয়ে গাঁথা, প্রেম সায়রে যৌবন হেম
অনলনিমগ্ন হলো যবে !

পেলো না হৃদয় কোনোখানে
হৃদি-পুষ্প রসে প্রেমী মন,
দেহ-প্রাণ হৃদয়বিহীন
হিংস্র-পশু-সঙ্কুল কানন !

ক্ষান্ত হও—চিত্ত গেল বলে
ফেরালাম চিত্তেরে সবলে—
মানবের ভাবী স্বপ্ন হিতে
মুগ্ধ কবিহৃদয় সঁপিতে !

প্রাণের সৌন্দর্যস্পৃহা যত
রম্যগীতে পেলো পরিণাম
অন্যদিকে কাঁপায়ে যৌবন
শুরু হলো মুক্তির সংগ্রাম !

নবচেতনায় হিল্লোলিয়া
জনমন নিঃশেষে প্লাবিয়া
কালের প্রবল পদভারে
মেদিনী কাঁপিলো অবিশ্রাম !

রাষ্ট্রচিন্তা-প্রাণিত অন্তর
সমাহিত জগৎজীবনে,
বিশ্ব-সংস্কৃতির মুখপট
অনাবৃত হলো মোর মনে।

পূর্বদেশে সামন্তযুগের
নরাস্থিকঙ্কাল, ধ্বংসশেষ,
জীবন্ত জীবন নিয়ে হোথা
দৃপ্তপ্রাণা প্রতীচ্যপ্রদেশ !

এনেছিল যান্ত্রিক ঘোষণা
বৃদ্ধ বিশ্বে দ্রুত রূপান্তর,
নব সত্য খুঁজেছে বিজ্ঞান
প্রকৃতিজগতে নিরন্তর !

নবযুগ-স্পর্শে সচেতন
জেগেছিল ঘুমন্ত ভারত,
ভাবী নবভুবনে বিকাশি
উঠেছিল দীপ্ত ভবিষ্যৎ !

যে ভারত যুগযুগ ধরে
জীবনবিরত, আত্মঘাতী,
যেন সন্ধিলগ্নে আজ মুক্ত হয়ে ছায়াগ্রাস
পাণ্ডুব পূষণ পূর্ণ ভাতি !

ছিল ঋষিসাধনাব ভূমি
আদিকাল হতে এ ভারত,
ভস্মাবৃত দেহে তার ঢাকা
অনলভাস্বত সত্যবোধ !

জড় প্রাণ মন অতিক্রমি
শাশ্বতেব পেয়ে সে দর্শন
থেমেছে সে, আর সে ভাবে না
জগৎ-স্থিতির উন্নয়ন !

বিশ্বের প্রাক্তন পঞ্চশীল
ভক্তি, জ্ঞান, শ্রদ্ধা, তপঃ, যতি,
ত্যাগ, ধৈর্য্য, নিষ্কাম কর্মই
লোক-প্রেম সেবার সঙ্গতি !

ছিল আর্য-ঐতিহ্য পাবন
আত্মতুষ্ট সাত্ত্বিক জীবন,—
মধ্যযুগ হতে উপেক্ষিত
ছিল তার যোগ্য বিতরণ।

সেই বিশ্বে হলেন উদয়
জগদ্বন্ধু নেতা মহাত্মাজী,
মৌন জনপ্রাঙ্গণে উদ্ভাসি
উঠিলো নিশ্ছল তাঁর হাসি।

দৈবী নতি, শ্রম শুভ্র বেশ,
আত্মশক্তি-অজেয় পাহাড়,
যেন চেতনাব আশীর্বাদে
ঘটালেন জড়ের সংস্কাব।

সে লোক পুরুষ অবহিত
হলেন প্রথম দর্শনেই,
বর্ধমান জড় যুগ-বাহে
হিত শ্রেয় শান্তি কিছু নেই।

রক্ত নেত্রে পশ্চিমে তাকায়ে
হেরিলেন রত্ন সৌধরাজী
পশুবল-ভুজদণ্ডে খাড়া
যেথা যুগদানব নিবাসী।

প্রথম যুদ্ধের খর তাণ্ডবে জগৎ
হয়েছিল আর্ত মর্মাহত
সবার সেবার তরে সে ধীর পুরুষ
হৃদয়ে ধরেছিলেন সত্য-অহিংসার পুণ্যব্রত !

পশুবলে মানুষ নির্জিত
হোক তা দুঃসহ ছিল তাঁর,
বিশ্বমুক্তি লয়ে মনে দেশের মুক্তির রণে
নিলেন নৈতিক অস্ত্রভার !

ভৌতিক যুগের সেই দুর্মদ গতিরে সৌম্যতায
সংযত মনুষ্যোচিত করে
তিনি এসেছিলেন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রচে দিয়ে যেতে
নবীন মানবতার তরে।

সে ছিল জড়ের নবোন্মাদ,
মনুষ্যত্ব আত্মপরাজিত,
বণিক সাম্রাজ্যবাদ ছিল
ধরিত্রীরে দুহিয়া জীবিত !

লড়ে জড় পশুত্বের সাথে
ছিল চিত্ত দ্রাবিত করার,
পূর্ণ অহিংসায় দানবেরে
শোষণ করার ছিল ভার !

পরাধীনতারও মাঝে তাঁর
আত্মা ছিল মুক্ত ও শাশ্বত,
অণু-মৃত সর্বজনহিতে
বিশ্বেরে জাগানো ছিল ব্রত !

প্রথম অসহযোগ সেটি
স্ফূর্ত হয়ে বাপুর আহ্বানে
ছেড়ে ছাত্রজীবন, নিজেরে
শেখালাম নব অভিজ্ঞানে !

নব যুগ-সংঘর্ষ বাহিরে,
অভ্যন্তরে অন্তর মন্থন,
পথপ্রদর্শয়িতা ঈশ্বর,
সম্মুখে নতুন আরোহণ !

মনস্তলে উপরে ও নীচে
নতুন সংঘর্ষ অফুরান,
তম-পর্বতের শত চূড়া
শতোর্মি প্রকাশে দীপ্যমান !

ভাবী নবযুগ শুতো ফিরে
বিগতেরে করে ক্ষতাহত,
আশা, সুখ, দুঃখ ও সঙ্কটে
সঙ্কুল ছিল যা অনাগত !

জগতের নিষ্ঠুর আঘাতে
ব্যথা পেত আহত হৃদয়,
পুলকবিস্মিত কবে তারে
স্বপ্নদূত দিত বরাভয় !

স্বর্গীয় সঙ্কেতে ভবে উঠে
অজানা ভয়ে সে যেত ছুটে,
স্বর্গ ও নরক বিশ্বজয়ে
চিত্তে তার ঘটাতো প্রলয় !

শ্লথ উপচেতন আবেগে
তমসাবিলেপ আকপোল,
সূক্ষ্ম ভাব যেত পিষ্ট করে
যুগবিকাশের রথরোল !

নিশা ও উষার সন্ধিক্ষণে
হৃদয়ে নামিত সঙ্গোপনে
জ্যোৎস্না-সম নবজীবনোষা
শ্রী-শোভা রচিয়া ভূ-প্রাঙ্গণে !

এখনো হয়নি পূর্ণ করা
মোর কবিকর্মের পসরা
গুহাহিত সত্য পৃথিবীতে
কোথাও পারিনি এঁকে দিতে
সে-আথর শুধু তটরেখা
ডোবে মুহুঃ চেতনা প্লাবনে
কারো বক্ষে রাখা নেই সেই
শ্রীস্বর্ণিম ঈশ্বরীপাবনে ।

ব্যক্তি এ বিশ্বের সংঘর্ষণে
নবমানবতা জাগে মনে
যে আজ বিকাশ পথে যেতে পারে এ জগতে
বিতরি বৈভব জনে জনে,
জন্ম পীঠিকায় নবভাবে
মর্তের অমর্ত জাত হোক,
ভূজ্জীবন মন অতিক্রমি
এ ভুবনে নামুক দ্যুলোক ।

মনের গীতল সিঁড়ি ধ'রে
যেতে গিয়ে যেন কবে হায়,
মধুস্বপ্নে ডালাখানি ধরে
নেমে এসে ছিলাম ধরায়

সম্মুখে নিশ্চল স্মিতাননা
প্রৌঢ় নব জীবনচেতনা
যেন সে ফুলকিরণ জলধি অতল মন
আয়তনয়ন নীলাঞ্জনা !

সে তার স্বর্গিক গরিমায়
স্ফূর্ত আজ ভিতরে বাহিরে,
আত্মিকতা পেয়েছে সে বর
বিশ্ব-ঐক্য মূর্তিত মন্দিরে।
হেম চৈতন্যের অগ্নি নব
যেন দীপ্ত নবনীত গিরি
জগত জনেরে বিতরিতে
ব'লে গেল যেন পিছু ফিরি।

ও নবনী পর্বত জঠরে
কোটি কোটি সূর্য প্রভা ধবে
বহির্দীপ্ত অন্তরে সংস্কৃত
নব মানবতা স্বমোহিত
লোকপ্রেম জন মনোরথ
যুক্ত যাতে ইন্দ্রিয় ও মন
অতিক্রমি অণুনাশ, ধরে
স্বরচনা প্রেমে সে জীবন।

আত্মা মুক্তি নিবৃত্তি—সকলি
যেন শুভ্র রিক্ত চিত্রপট,
স্নেহালোকহারা শিখাসম
শূন্যনভে ঈশ্বর নিস্তট !
বিজ্ঞানে এখন ভরে নাও
সুরার বদলে ক্ষমামৃত।

জড়ে ঢেলে চেতনা, জীবন
কবে তোলো হীবক-বচিত।

দিশি ও কালেব হর্ম্যে শুনি অনুক্ষণ
পদধ্বনি তোমাব নিঃস্বব,
তোমার ভিতর থেকে জেগে উঠে
তোমাতেই খোঁজে তাব লয
সৃজন বভসে অনুপ্রেবিত এ বিশ্বচরাচর।

রুপালি হৃদযে হিম শিখবগুলিব পরে আজ
জেগে ওঠে স্বর্ণরথচক্রের ঘর্ঘব
কবি-কল্পনার বক্ষে জুড়ে ঐ নামে প্রভাস্বব
সপ্তাশ্বসূর্যেব মতো ভবিষ্যভুবন অগোচব।

পরিশিষ্ট